BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE
CALCUTTA
Date 11. MAY 1928

অঙ্গরাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ

চম্মকে কোমল শুভ্র ও
উজ্জ্বল করে ::   ::
ব্রণ মেচেতা ফুসকুড়ি
প্রভৃতি মিলাইয়া যায়

সান্ধ্য প্রসাধনে মুখের
লাবণ্য বর্দ্ধন করে ::
ক্ষৌরকার্য্যের পর ব্যবহারে,
অত্যন্ত আরাম বোধ হয়

প্রস্তুতকারক—দি বেঙ্গল পারফিউমারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস
সোল এজেণ্টস—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
৪৩ ক ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

IMPERIAL LIBRARY

কেশরঞ্জন তৈল

নিদাঘের এই কর্ম্মক্লান্ত

অবসন্ন দেহকে শীতল ও মনকে প্রফুল্ল রাখিতে হইলে,

বেঙ্গল মিস্‌লেনীর

নানাবিধ ফলের সিরাপ দরকার হইবেই

পল্টন

গোলাপ

কলা

কমলা লেবু

পাতি লেবু

ইত্যাদি।

সিরাপ

স্নিগ্ধ
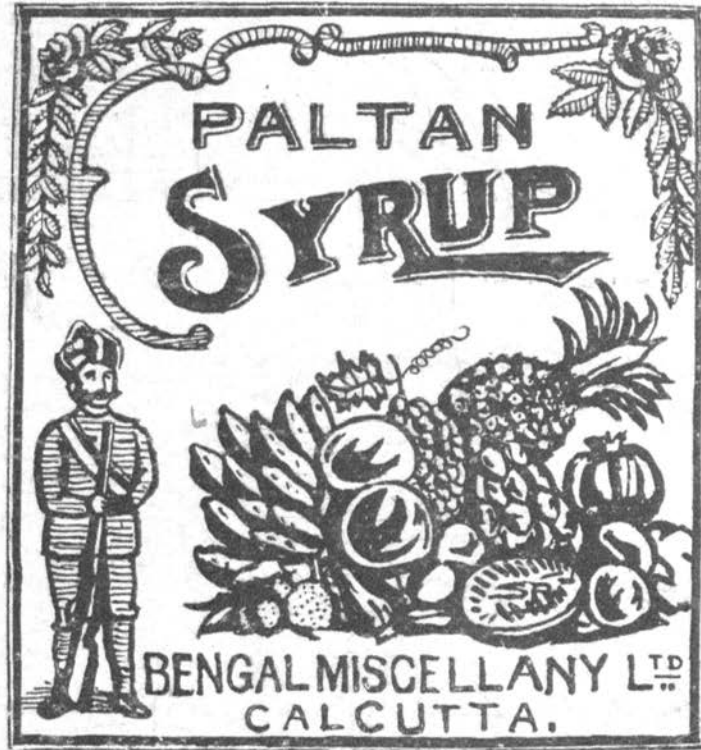
হৃদ্য

সদ্য

ও

নির্ম্মল

বাজারে সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

বেঙ্গল মিসলেনী লিঃ

৯৯, মাণিকতলা মেন্ রোড, কলিকাতা।

Cover Printed at the Mohan Press, Calcutta.

RARE BOOK

বর্ষ-সূচী

১৩৩৪ সাল

RARE BOOK

বর্ষ-সূচী

১৩৩৪ সাল

চিত্র-সূচী

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane, and Printed by K. Lahiri, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

IMPERIAL
(963)
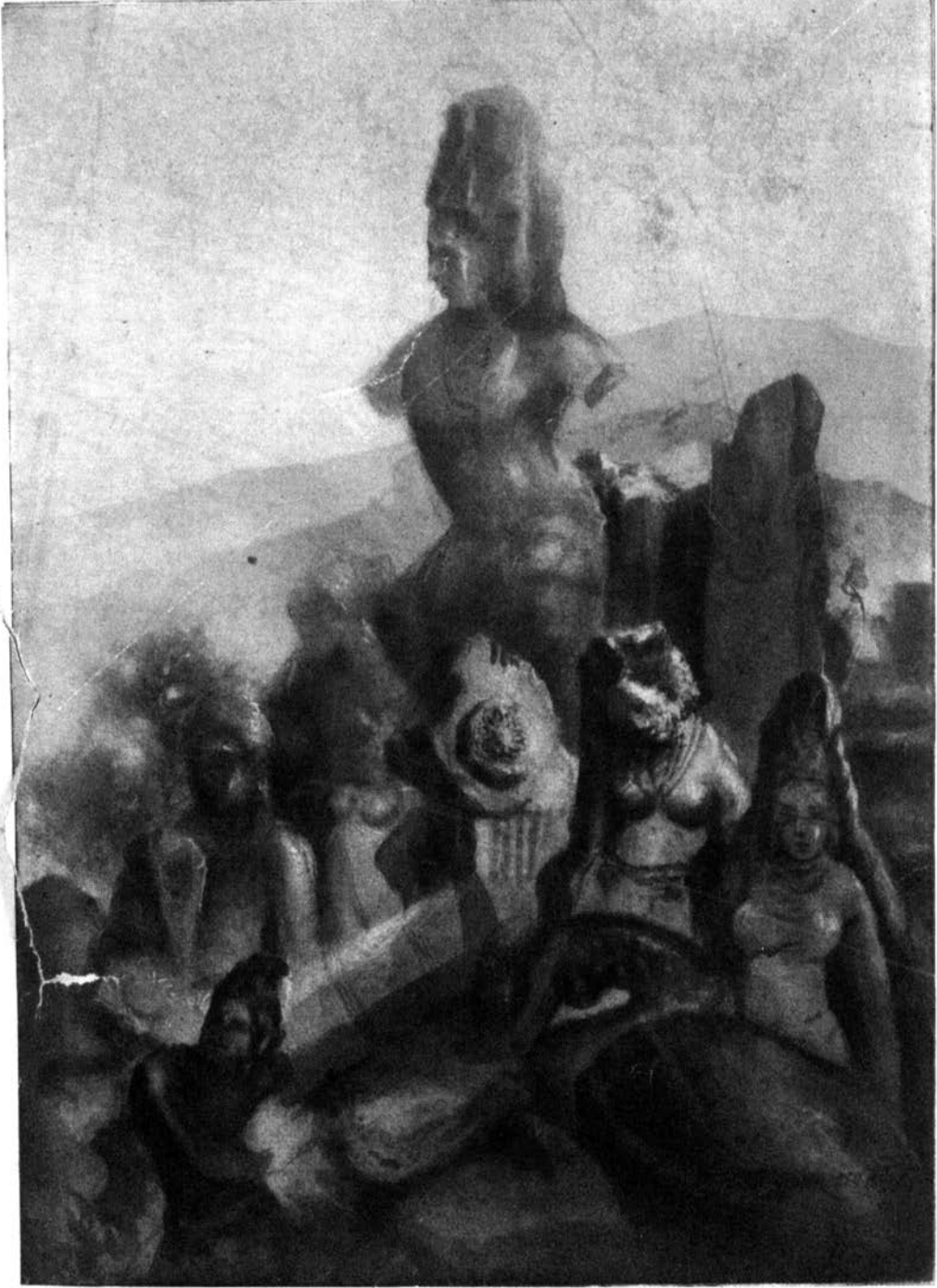
কল্লোল

অতীতের প্রহরী
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Gaya Art Press, Calcutta.

কল্লোল

বৈশাখ, ১৩০৪

স্বাক্ষর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার হাতের অরুণ লেখা
পাবার লাগি, রাতারাতি
স্তব্ধ আকাশ জাগে একা
পূবের পানে বক্ষ পাতি ॥

তোমার রঙীন তুলির পাকে
নামাবলীর আঁকন আঁকে,
তাই নিয়ে তো ফুলের বনে
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি ॥

এই কামনা রইল মনে,—
গোপনে আজ তোমায় ক'ব,—
পড়বে আঁকা মোর জীবনে
রেখায় রেখায় আখর তব।

দিনের শেষে আমায় যবে
বিদায় নিয়ে যেতেই হবে
তোমার হাতের লিখনমালা
সুরের সুতোয় যাব গাঁথি ॥

———

বাণ্

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

রোহিলখণ্ডের রেলপথ দিয়ে আমাদের ট্রেণখানা ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সন্ধ্যের কিছু পর থেকে সেই যে ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়েছে তার আর বিরাম নেই। অন্ধকার দু-দিক থেকে যেন গাড়ী-খানাকে ঠেসে ধরেছে। দূরে কষ্টিপাথরের মত কালো আকাশের গায় থেকে থেকে বিদ্যুতের কষ্ উঠ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। বাজের আওয়াজ আর বর্ষার অবিশ্রাম ঝর্ঝর ধ্বনির অন্ত নাই। দুর্য্যোগ—ভীষণ দুর্য্যোগ।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাঙা গাড়ীর সোয়ারী আমরা। জান-লার ঝিলমিলিগুলো নেই বল্লেই চলে। মাথার ওপরে যে আচ্ছাদন তারই অদৃশ্য অবকাশ বয়ে অবিরল জলধারা যাত্রীদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। যাত্রীর দল এতেই সুখী। তাদের চারপাশের ভিজে পোটলাপুঁটলীগুলোর মত তারাও নেতিয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা দিচ্ছে।

গাড়ী চল্তে চল্তে শেষরাত্রির দিকে জঙ্গলের মাঝে এক জায়গায় থেমে গেল। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ কোরে সে-ও ঝিমিয়ে পড়্ল। আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। একমাত্র বৃষ্টির শব্দে বন মুখরিত, বজ্রধ্বনিও তখন থেমে গিয়েছিল।

সকাল বেলা জানতে পারা গেল, বর্ষায় রেলের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় একটা ট্রেণ উল্টে গিয়েছে। যতক্ষণ না রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের গাড়ীখানা নড়্বার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

সংবাদটা শুনে যাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্ল। বিপদ যতই গুরুতর হোক না কেন, না-জানার অন্ধকারে পড়ে যাত্রীরা এতক্ষণ হাঁপিয়ে মরছিল, সংবাদটা এসে যেন তাদের মুক্তি দিলে। এবার তারা বেশ নিশ্চিন্ত হোয়ে কবে কোন্ সালে কি রকম রেল-দুর্ঘটনা হয়েছিল তারই আলোচনা করতে লাগ্ল।

ব্যাপারটা মন্দ লাগছিল না। রেলপথে চলতে চলতে দু-পাশের এই সব গাছপালা যারা চোখের সামনে দিয়ে শুধু পালিয়েই বেড়িয়েছে আজ তাদের সঙ্গে নিবিড় পরি-

চয়ের সুযোগ মিলে গেল। আমি গাড়ী থেকে নেমে ওরই মধ্যে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। বর্ষণ-ধৌত নানান্ আভার সবুজের সমারোহ দেখে আমার রাত-জাগা ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে গেল। দূরে একটা গাছে টক্‌টকে লাল ফুল ধরেছিল, কি সে ফুল তা জানি না, তবে তার মাথা অন্য সব গাছকে ছাড়িয়ে উঠেছে। মনে হোতে লাগ্‌ল, যেন সদ্যস্নাতা বনলক্ষ্মী সীমন্তে সিঁদুর পরে রোদে চুল শুকোচ্ছেন।

বনের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি যে, যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কে একজন সাহেব নাকি তাদের বলে দিয়েছে—এখুনি গাড়ী ছাড়বে।

আশায় আশায় বোধহয় দু ঘণ্টা কেটে গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় যাত্রীরা কাতর হোয়ে পড়তে লাগ্‌ল। খাবার অথবা এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। অনেক লোক গাড়ী থেকে নেমে হেঁটেই রওনা হোতে সুরু করলে। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলুম—কাছাকাছিই তাদের বাড়ী,—এই দশ থেকে বিশ ক্রোশের মধ্যে। কাজের লোক তারা।

আমার কোন কাজ নেই, কোথাও যাবার তাড়াও নেই। বসে বসে ভাবতে লাগলুম—কি করা যায়!

ক্রমে আমাদের কামরাও খালি হোতে আরম্ভ করলে। একটি দুটি কোরে অধিকাংশ লোকই নেমে গেল। শেষ কালে আমিও গাড়ী থেকে নেমে একটা দলের পেছন পেছন চলতে সুরু কোরে দিলুম। দেখাই যাক্ না এ রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ হয় ত আর মিল্‌বে না।

যাত্রীদের সঙ্গে ভিড়ে গেছি। রেলের রাস্তা থেকে নেমে গ্রামের রাস্তা ধরা হয়েছে। হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পৌঁছলুম।

সেটা একটা পুরোণো শহর, নাম মনে নেই। বাড়ী-গুলো নীচু, দেখলেই মনে হয় যেন অনেকদিন আগে-কার তৈরি। যাত্রীরা ঠিক করলে রাত্রিটা এখানকার সরাইয়ে কাটিয়ে সকালে আবার যাত্রা সুরু করা যাবে।

সরাইয়ে এসে যখন পৌছুলুম তখন অন্ধকার বেশ ঘোরালো হোয়ে এসেছে। সরাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হয় সেও যেন অনেক দিনের পুরোণো। অনেকখানি জায়গা চওড়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, সেই দেওয়ালের গায়েই ভেতর দিকে ছোট ছোট ঘর। মাঝখানটা ফাঁকা। এই জমির স্থানে স্থানে আর ছাতের ওপরে বেশ ঘন জঙ্গল হোয়ে আছে। ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন, কখনো সেখানে লোক বাস করেছে বলে মনে হয় না। বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে ওরি মধ্যে একখানা ঘর দেখে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়া গেল। পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ল জানতেও পারলুম না।

ঘুম ভাঙতে বেলা হোয়ে গিয়েছিল। উঠে দেখি যাদের সঙ্গে এসেছিলুম তারা যে যার গন্তব্য স্থানে চলে গিয়েছে। আমি ঘুরে ফিরে সরাইটার সঙ্গে ভাল কোরে পরিচয় করতে লাগলুম।

সরাইয়ের প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর মতন ফটক। কিন্তু তার রাজসিক ভাব এখন আর নেই। রাজ্যহীন রাজার দরোয়ানের মতন শুধু সে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। অসংখ্য ঘর, অনেক ঘর ভেঙে পড়েছে। এই ভাঙা বে-ওয়ারিশ ঘরগুলোর বেরিয়ে-পড়া বরগার ওপরে কোনো রকমে একটু ছাউনী কোরে অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে বাস করে। এদেরই অসংখ্য ছেলেপিলে মাকড়শার বাচ্চার মত সরাইয়ে কিল-বিল কোরে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য কুকুর এখানে সেখানে বসে আছে, এদের হালচাল দেখে মনে হয় যেন এরাই এখানকার আসল মালিক। এক একটা ঘরে কুকুরী তার বাচ্ছা নিয়ে শুয়ে আছে, দৈবাৎ কোনো যাত্রী সেখানে ঢুকলে কুকুরী চীৎকার [illegible] বিরক্তি জানায়। তাদের ঘরও ভাঙা নয়, আস্ত। ব[illegible] কি এই মানুষ বাচ্ছাগুলোর চেয়ে কুকুরের বাচ্ছাগুলো সেখানে অনেক যত্নে আছে।

সরাই দেখা শেষ কোরে শহর দেখতে বেরুলুম। শহরের অবস্থা সরাইয়ের চেয়ে খুব বেশী উন্নত নয়। ছোট ছোট ভাঙা নীচু বাড়ী, মাঝে মাঝে একটা আস্ত নতুন বাড়ী। এরাই এ যুগের বড়লোক অর্থাৎ রহিস্।

সে সময় সেখানে কিসের একটা মেলা বসবার আয়োজন হচ্ছিল। সন্ধান নিয়ে জানতে পারা গেল যে, এ মেলা এখানে অনেক দিন থেকেই হচ্ছে—সেই সত্যযুগের কাছাকাছি সময় থেকে।

অনেক দিনের কথা। একবার পার্ব্বতী ভোলানাথের সঙ্গে ঝগড়া কোরে মনের দুঃখে চলে এসে এইখানে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহস্থের মেয়ে ছিল না, তারা সেই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে নিজের সন্তানের মত পালন করতে লাগলেন। ওদিকে কিছুদিন যেতে না যেতেই মহাদেব মহা মুস্কিলে পড়লেন। ক্ষিদের সময় খাবার, মৌতাতের সময় কল্কে এ সব দেয় কে! তিনি যোগাসনে বসে পার্ব্বতীর খবরাখবর সব জেনে নিয়ে একদিন সেই গৃহস্থের কুটীরে এসে হাজির। পার্ব্বতীর অভিমান তখনো ভাঙেনি। তিনি কিছুতেই যাবেন না, মহাদেবও ছাড়বেন না। শেষকালে সেই গৃহস্থ ও তার স্ত্রী পার্ব্বতীকে বুঝিয়ে স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজী করালে।

ভোলানাথ তখন খুশী হোয়ে গৃহস্থকে বল্লেন—তোমার কি চাই বল?

গৃহস্থ এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি। লোকটা বর দিতে চায় দেখে তার মনে খট্‌কা লাগ্‌ল। যা থাকে কপালে ভেবে সে বলে ফেল্লে—দেবতা, যখন খুশী হয়েছ তখন তোমরা চিরকাল স্বামী-স্ত্রীতে আমার ঘরে বাস কর, আমি প্রাণপণে তোমাদের সেবা করব।

মহাদেব তখন মহা প্যাঁচে পড়ে গেলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে গৃহস্থের ঘরে রয়ে গেলেন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁরা সেইখানে আছেন। যে দিন তাঁরা আত্মপরিচয় দিয়ে সেখানে বাস করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন প্রতি বৎসরে সেই তিথিতে সেখানে মেলা বসে ও প্রায় পনেরো দিন ধরে মেলা চলে। আশপাশের প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল দূর থেকে লোকে এই মেলায় যোগ দিতে আসে। ক'দিন খুব ধূমধাম নাচ-গান হয়।

দেবতাদের দেখতে গেলুম। পার্ব্বতীর সেই সোনার বর্ণ কালী হোয়ে গেছে; মহাকালের স্পর্শে তাঁর নবনীত কোমল দেহ পাথর হোয়ে গেছে।

মেলা আরম্ভ হোতে তখনও দু-তিন দিন দেরী ছিল। মেলাস্থানে তখুনি দোকানপাট বসে গিয়েছে, চারদিক থেকে লোক আসছে। অনেক লোক মাঠে তাঁবু ফেলেছে, যাদের অবস্থায় কুলোয়নি তারা আকাশের তলাতেই বাস করছে।

সরাইয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানেও মেলার সাড়া পড়ে গিয়েছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানেও অনেক লোক এসে জমেছে।

সে দিনটা কোনো রকমে সেইখানেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। পরদিন উঠে দেখি যে, সরাই একেবারে লোকে লোকারণ্য। শুধু ঘরগুলো নয়, মাঝখানের সেই ফাঁকা জমিতেও দলে দলে নরনারী বসে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকাল বেলা আর কোথাও না গিয়ে আমি সেইখানেই ঘুরে ফিরে তাদের দেখে বেড়ালুম।

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছি, এমন সময় আমার ঘরের কাছেই তুব্‌ড়ী বাঁশীর শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি এক সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা গোখ্‌রো সাপ বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে দুলছে আর ফুলছে। আর একদিকে একটা লোক ভোজবাজী দেখাচ্ছে। খেলা দেখানোর চেয়ে লোকটার বক্তৃতা করবার শক্তি অদ্ভুত। বাজী দেখানো ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক বক্তা হোলে এর চেয়ে সে ঢের বেশী পয়সা রোজগার করতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে খাতিরও পেত। আর এক দিকে বাঁশ-বাজীর আয়োজন হচ্ছে। এরা কথা কয় না, ঢাক বাজায়। ঢাকের আওয়াজ শুনে তাদের ঘিরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়েছে। মোট কথা সরাইয়ের মধ্যেই একটি ছোটখাট মেলা বসে গিয়েছে। যাত্রীদের ভারি ফুর্ত্তি। না চাইতেই তারা পয়সা দিচ্ছে, খরচ করতেই তারা এসেছে।

চারদিক ঘুরে ফিরে আবার সাপুড়ের কাছে এসে

দাঁড়ান গেল। সে তখন খুব জমিয়ে ফেলেছে। কারুর মাথা, কারুর নাক, কারুর পকেট থেকে টপাটপ্ সাপ বের করছে। চারদিক থেকে ঝপাঝপ্ পয়সা পড়ছে। সকলেই সন্ত্রস্ত, কখন কার কাছ থেকে সাপ বেরিয়ে পড়ে।

খেলা শেষ হোয়ে গেলে সে পয়সাগুলো কুড়িয়ে গোখ্রো সাপের টুক্রীর মধ্যে ফেলে ওঠবার উপক্রম করছে এমন সময় একটা মুরুব্বী গোছের লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলে—এত তো গুণ শিখেচিস্ খেলতে-টেলতে কিছু জানিস্?

সাপুড়ে বল্লে—জানি বৈ কি কিছু কিছু।

—তবে খেল্ না।

—টাকা লাগ্‌বে। পাঁচ টাকা দিতে হবে।

—পাঁচ টাকা না বিশ টাকা। চারটে টাকা দেব, খেল্।

সাপুড়ে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌ল। একবার আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে—কে খেল্‌বে, তুমি?

মুরুব্বী লোকটা বল্লে—আমি খেল্‌তে জানি না। টাকা দিচ্ছি; কেউ যদি জানে তো এগিয়ে আসুক।

সাপুড়ে চেঁচিয়ে বল্লে—লালাজী টাকা দেবে, এর মধ্যে যদি কোনো গুণী থাক তো এগিয়ে এস—আধাআধি বখরা—।

দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌ল; নতুন আমোদের আশায় তারা কলরব সুরু কোরে দিলে! ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে একেবারে প্রহেলিকা বলে বোধ হোতে লাগ্‌ল। কি যে হবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম। সাপুড়ে আবার চেঁচিয়ে বল্লে—দেখ, লালাজী চার টাকা দেবে, আর এত লোক দাঁড়িয়েছে তারাও পয়সা দেবে। প্রায় দশটাকা হবে। যদি কেউ গুণী থাক তো এগিয়ে এস, যা পাব তার অর্দ্ধেক দেব।

দুঃখের বিষয় কোনো গুণীই এগিয়ে এল না।

সাপুড়ে হতাশভাবে আর একবার চারিদিকে চেয়ে সেই মুরুব্বীকে বল্লে—হুজুর, মেলায় একজন গুণী এসেছে, আমি তাকে ডেকে নিয়ে আস্‌ব। কাল সকালে খেলা হবে।

তারপর চারদিকে ঘুরে কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে বাঁক কাঁধে তুলে তুব্‌ড়ী বাজাতে বাজাতে সে একদিকে চলে গেল।

মেলা উপলক্ষ্যে এক রইসের বাড়ীতে সদাব্রত খোলা হয়েছিল, সেইখানে সন্ধ্যাবেলার ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা কোরে ঘরে বসে হজমী গুলির হিন্দী বিজ্ঞাপন পড়ছি এমন সময় সেখানে সকাল বেলার সেই সাপুড়ে এসে উপস্থিত। পশ্চিমে বিশেষতঃ সরাইয়ের মতন জায়গার এ রকম ব্যাপারে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমি তাকে বসতে বল্লুম। সে কম্বলের পাশে মাটীতে বসে বল্লে—তোমার বাড়ী বাংলা দেশে?

—হ্যাঁ

সে বল্লে—আমি কলকাতা গিয়েছি। ভারী শহর।

চুপ কোরে তার বায়নাক্কা শুনে যেতে লাগলুম। জবাব দিচ্ছি না দেখে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। তারপর টপ্ কোরে কম্বল থেকে একটা বিড়ি তুলে মোমবাতির শিখায় ধরিয়ে নিয়ে গল্‌গল্ কোরে খানিকটা ধোঁয়া আমার মুখের ওপরে ছেড়ে দিল। তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমায় বল্লে—তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি, বড্ড দরকার।

—কি দরকার বল দিকিন?

সাপুড়ে উঠে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে এল। তারপরে একটু ইতস্তত কোরে বলে ফেল্লে—কাল তোমাকে আমার সঙ্গে খেল্‌তে হবে।

—খেলতে হবে? সে আবার কি!

—হ্যাঁ। অবিশ্যি তোমাকে পড়্‌তে-টড়্‌তে কিছু হবে না। সে সব যা কিছু করবার তা আমিই করব। যা পাব আধা-আধি।

ব্যাপারটা তবুও আমার কাছে পরিষ্কার হোলো না। আমি বল্লুম—দেখ বাপু, ঐ খেলা-টেলা যা বল্‌ছ সে সব আমি জানি না।

সাপুড়ে অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বার দুয়েক মুখে চক্ চক্ আওয়াজ কোরে বল্লে—বাবু, ওসব কি আর এখনকার দিনে কেউ জানে? তবুও কি করি, পয়সা রোজগারের জন্য সবই করতে হয়—সবই করতে হয়।

কৌতুহল আর চেপে রাখা অসম্ভব হলো। জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বল তো। ও সব হেঁয়ালী ছাড়।

সাপুড়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক্ হোয়ে চেয়ে রইল। এত সাধারণ ব্যাপার আবার লোকে জানে না! কথাটা বোধ হয় সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বল্লে—আরে তোমার দেশের কামরূপের খেলা জান না? বাণমারা বিদ্যা!

কামরূপ কামাখ্যার এই মারণ-বিদ্যার কথা ছেলে বেলা থেকে শুনে আসছি। সে সম্বন্ধে অনেক সাংঘাতিক ইতিহাসও শোনা গেছে। শেষকালে কিনা আমাকেই—

আমি বল্লুম—রক্ষে কর বাবা! ও সব আমার দ্বারা হবে না।

সাপুড়ে বল্লে—ভয় পাচ্ছ কেন? এতে ভয় পাবার তো কিছু নেই।

ভাবতে লাগলুম—ভরসাই বা কোথায় তা তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমাকে চিন্তা করবার অবসর না দিয়ে সে আবার সুরু করলে—দেখ আমরা দু'জনে মুখোমুখী হোয়ে দাঁড়াব। তারপর তুমি মাটী থেকে চাট্টি ধূলো তুলে নিয়ে বিড়্বিড়্ কোরে মন্ত্র পড়ে সেই ধুলো আমায় মারবে। আমি মন্ত্র পড়ে সে মার যেন কাটিয়ে দেব। তারপর খানিকটা ধুলোতে মন্ত্র পড়ে আমি তোমায় মারব। তোমার যেন খুব লেগেছে এই ভাব দেখাবে। তারপর একটু মন্ত্র পড়ে সে জায়গাটা ফুঁ দিয়ে মার কাটিয়ে আবার আমায় মারবে। এবারের মার খেয়ে আমি ঘুরে পড়ে যাব। এই রকম বারকয়েক পড়াপড়ি হোয়ে আমাদের খেলা শেষ হ'বে। এর মধ্যে ভয় পাবার তো কিছু নেই।

বলতে কি প্রস্তাবটা আমার ভালই লাগ্ল। উত্তেজনার অভাবে কয়েকদিন ঝিমিয়ে থাকা গিয়েছে, এ একটা মন্দ হবে না। বিশেষ আমার এই খাটুনীটা যখন নিরর্থক যাবে না। তাকে বল্লুম—আচ্ছা রাজি। কাল সকালে আমি ঠিক হাজির হব, তুমি এস।

সাপুড়ে চলে যাবার পর তার কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করতে লাগলুম। অতগুলো লোককে বোকা বানিয়ে সেই মিথ্যা অভিনয় করবার কথা মনে হওয়ায় হাসি পেতে লাগল। একবার মনে হোলো লোকটা আমাকেই বোকা বানাবে না তো। আমি তাকে ধুলো মারব তারপর সে যদি বাহাদুরী দেখাবার জন্য সত্যিকারের একটি বাণ্ ছাড়ে! সর্ব্বনাশ! তা হোলেই তো গিয়েছি! হায় হায়! এত সহজ কথাটা তখন মনে হোলো না!

ভয়ে ভাবনায় রাত্রে ভাল কোরে ঘুমুতে পারলুম না। পরদিন সকালে উঠে দেখি সরাইয়ে আর লোক ধরে না। একে ক'দিন থেকে সেখানে যাত্রীর ভীড় লেগেছিল, তার উপরে এই খেলার কথা কি কোরে মেলায় গিয়ে পৌচেছিল, ফলে সেখান থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগ্ল।

সাপুড়ে এসে আমায় নিয়ে একেবারে কালকের সেই জায়গায় উপস্থিত করলে। তারপর বাঁক নামিয়ে তুব্ড়ী বাজিয়ে একবার সাপ খেলিয়ে কিছু রোজগার কোরে নিলে। সাপ খেলানো শেষ হোয়ে যাবার পর আমার হাত ধরে আসরে নিয়ে গিয়ে বল্লে—এই গুণী বাংলা দেশ থেকে এসেছে। সাধু লোক, অনেক বিদ্যে এর জানা আছে।

এই অবধি বলে সে কালকের সেই লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আজ সেই মুরুব্বী লোকটার আর খাতিরের অন্ত নেই। কোথা থেকে একটা মোড়া জোগাড় কোরে এনে সে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আশেপাশে দু'চারজন পারিষদও জুটেছে। সাপুড়ে তার কাছে গিয়ে বল্লে—কৈ টাকা দাও।

লোকটা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বল্লে—আগেই টাকা দিতে হবে!

সাপুড়ে বল্লে—হ্যাঁ আগেই দিতে হবে। ও-সব কারবার আমার নেই।

মুরুব্বী এবার অতি কষ্টে ট্যাঁকের বত্রিশ পাক খুলে

চারটী টাকা বের কোরে সাপুড়ের হাতে দিলে। টাকা কটা আমার হাতে দিয়ে সাপুড়ে চেঁচিয়ে বল্লে—যে খেলা দেখবে সে পয়সা ফেল। বাজে লোক সরে যাও—ভীড় বাড়িও না।

তার কথা শেষ হোতে না হোতে চারদিক থেকে টপাটপ্ পয়সা পড়তে লাগ্‌ল। সাপুড়ে পয়সাগুলো কুড়িয়ে আমার জিম্মায় দিলে। আমি টাকাপয়সাগুলোকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে খেলবার জন্য প্রস্তুত হ'লুম।

খেলা সুরু হোলো। সাপুড়ে তুবড়ী বাজাতে বাজাতে আমার সামনে কুস্তির পাঁয়তারার মত পা ফেলে অর্দ্ধচক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ কোরে দিলে। আমার ভয় তখনো ভাঙে-নি। তার ওপরে তার সেই হাত-পা খেলানোর ওস্তাদী কায়দা দেখে আমার মনে হোতে লাগ্‌ল এ যাত্রায় বোধ হয় আর নিষ্কৃতি নেই। কোনো রকমে নিজেকে স্থির কোরে মাটী থেকে চাট্টি কাঁকর তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাকে ছুঁড়ে মারলুম। সে একটা হাত ঝেড়ে যেন —রামঃ এ কিছুই নয়—এই রকম একটা ভাব দেখালে। তারপর সে চাট্টি কাঁকর তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে আমায় মারলে।

ব্যস্! যা সন্দেহ করেছি তাই! ঠিক বাণ ছেড়েছে! তার কাঁকর গায়ে লাগ্‌তেই আমার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে চিড়্‌বিড়িয়ে উঠ্‌ল। এখন কি করি! হাত-পা আমার ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে আরম্ভ করলে।

সাপুড়ে আমার অবস্থা দেখে দু'পা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বল্লে—কি? ও রকম করছ কেন! খেল —খেল।

তাইত! কিছুই হয়-নি তো আমার! মাথাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে আবার কাঁকর তুলে তাকে মারলুম।

হায় বাপ্—বলে সে একেবারে বসে পড়ল। তার পরে তখুনি উঠে সে আমায় মারলে। আমিও তার দেখাদেখি দুই একবার বসে পড়লুম। এই ভাবে আমাদের খেলা চল্‌তে লাগ্‌ল।

প্রায় মিনিট পনেরো খেলা চলেছে এমন সময় সেই মুরুব্বী চেঁচিয়ে উঠল—এই তোমরা মিলে খেল্‌ছ। ও-রকম করলে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

অমনি চারদিক থেকে চীৎকার সুরু হোলো—আপোষে খেলছে—আপোষে খেলছে—ওরকম করলে চল্‌বে না।

খেলা থেমে গেল। সাপুড়ে তাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে। শেষকালে একজন মধ্যস্থ হোয়ে মিটমাট কোরে দেওয়ায় আবার খেলা সুরু হলো।

এবারে কিছুক্ষণ খেলা চলবার পর একবার আমার বাণ্ খেয়ে সাপুড়ে দমাস্ কোরে মাটিতে পড়ে গেল। কোনো রকম অবলম্বন না থাক্‌লে লাঠি যেমন পড়ে সাপুড়ের পড়বার কায়দাও তেমনি আশ্চর্য্য। তাকে পড়তে দেখে চারদিককার লোক—সাবাস্—সাবাস্—মারা —জয় কামাখ্যা মাই কি জয়—বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

ওদিকে সাপুড়ে আর ওঠে না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরে তার কাছে গিয়ে দেখি যে তুবড়ী বাঁশীটা তার মুখের মধ্যে প্রায় আধখানা ঢুকে গিয়েছে আর দু' কষ বয়ে ভল্ ভল্ কোরে রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাঁশীটা তার মুখ থেকে টেনে বের কোরে দিয়ে আবার আমার জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু সাপুড়ে আর উঠ্‌ল না, আস্তে আস্তে তার চোখ দুটো বন্ধ হোয়ে গেল।

চারদিকের লোকেরা কোলাহল কোরে উঠ্‌ল— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—মরে যাবে।

আমি আবার এগিয়ে গিয়ে তার এক খানা হাত টেনে বল্লুম—এই ওঠ্।

কিন্তু সে নিস্পন্দ হোয়ে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে ভিড় ভেঙে দু-চার জন লোক সাপুড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। একজন তার চোখ টেনে পরীক্ষা কোরে বল্লে— মরে গেছে যে দেখ্‌ছি।

কি সর্ব্বনাশ! মরে গেছে! আমার দুই কানের ভেতর যেন জাহাজের ভোঁ বাজতে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে সাপুড়ের চারিদিকে রাজ্যের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা যারা ছিল তারা হায় হায় করতে আরম্ভ কোরে দিলে।

একবার মনে হোলো এই অবসরে লম্বা দিই। কিন্তু পা দুটো এত কাঁপতে লাগ্ল যে নড়্তে পারলুম না।

ইতিমধ্যে সেই মুরুব্বী গোছের লোকটা সেখান থেকে ভিড় সরিয়ে দিয়ে আমায় বল্লে—পাজী, বদমাইস—এখুনি এর মার ছাড়িয়ে দে। নইলে আমরা মেরে তোকে খুন করব। দে ছাড়িয়ে।

আমি ধীরে ধীরে সাপুড়ের কাছে গিয়ে যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছি এই রকম ভাব দেখিয়ে তার কানে কানে বল্লুম—বন্ধু হে, আর কেন? এইবার উঠে পড়, নইলে এরা আমায় প্রহার দেবে বল্‌ছে।

—সাপুড়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

নিশ্বাস পড়্‌ছে কিনা জানবার জন্য তার নাকের গোড়ায় হাত দিলুম কিন্তু সেই ঘন দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের কোন ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ও-দিকে সেই মুরুব্বী লোকটা মহা আস্ফালন সুরু করেছে—ওঠাও ওকে, নইলে কোতোয়ালীতে দেব।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল। কেউ কেউ প্রস্তাব করলে—কোতোয়ালীতে দেবার আগে বেশ কোরে প্রহার দেওয়া যাক্। আমি সেই মুরুব্বীটীকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লুম—এদের থামাও নইলে তোমারও বিপদ। মনে থাকে যেন তুমিই টাকা দিয়ে খেলা সুরু করিয়েছিলে।

কথাটা বোধ হয় তার মনে লাগ্‌ল। সে তখনকার মতন সকলকে নিরস্ত কোরে আমায় বল্লে—কিন্তু এখুনি ওর মার ছাড়াও।

আমি এবার সাপুড়ের বুকে কান দিয়ে পরীক্ষা করলুম। মনে হোলো যেন অতি ক্ষীণ নিশ্বাস পড়্‌ছে। একজনকে বল্লুম, জল নিয়ে এস।

তখুনি জল এসে হাজির। আমি মন্ত্র পড়ে তার চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌লুম। প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করার পর সাপুড়ে চোখ চাইলো। চারদিকের লোকেরা জয়ধ্বনি কোরে উঠ্‌ল। তাদের বল্লুম—একে তুলে আমার ঘরে নিয়ে চল।

কয়েক জন এগিয়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে আমার কম্বলে শুইয়ে দিলে। একজন তার বাঁক নিয়ে এসে ঘরের এক কোণে রাখলে। আমি তখন সবাইকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার শুশ্রূষা করতে লেগে গেলুম।

কিছুক্ষণ বাতাস করবার পর সে যেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগ্‌ল। আমি একজন লোককে ডেকে তার জন্য খানিকটা গরম দুধ আনতে পয়সা দিলুম। দুধ খেয়ে সে উঠে বস্‌ল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি বল দিকিন্। ও রকম করলে কেন? বলা নেই কওয়া নেই—আচ্ছা লোক তো তুমি!

সাপুড়ে গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বল্লে—কি করি বল? ওরা বলতে লাগ্‌ল—মিলে খেল্‌ছে, এ না করলে কি উপায় ছিল!

—আর একটু হোলেই যে হাতে দড়ি দিয়েছিলে বাপু! উঃ কি রক্ত!

সাপুড়ে বল্লে—লোক দেখাবার জন্য আমরা টাক্‌রায় ঘা কোরে রাখি। খেলবার সময় বাঁশী দিয়ে তাতে খোঁচা দিলেই রক্ত বেরোয়। কি রকম বেটকা লেগে যাওয়ায় একেবারে বেহুঁশ হোয়ে পড়েছিলুম।

আহা হা, কি কাজই করেছিলে! ইচ্ছা হোলো লোকটার গালে ঠাস কোরে একটি চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু কি জানি বাবা, আবার যদি দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে এই ভয়ে সে অভিলাষ সম্বরণ কোরে তাকে বল্লুম—শুয়ে পড়।

সাপুড়ে শুয়ে পড়ল। রক্তপাতে তার শরীর খুব অবসন্ন হোয়ে পড়েছিল। শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে বিকেলে ঘরে এসে দেখি সে তখনো ঘুমুচ্ছে। তাকে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম—কিছু খাবে?

সে বল্লে—একটু খিচড়ী খাওয়াতে পার?

মনে হোলো, খিচুড়ী ছেড়ে তুমি এখন পোলাও খেতে চাইলে আমায় তাই খাওয়াতে হবে। উঃ আজ কি ফাঁড়াই না কেটেছে!

তাকে বসিয়ে আবার বাজারে চল্লুম খিচুড়ীর ব্যবস্থা করতে। রাত্রি আটটা কি নটার মধ্যে খিচুড়ী তৈরী কোরে তাকে খেতে দিলুম। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে সে বল্লে—বেশ হয়েছে।

আমিও খেয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লুম। সকাল বেলা সাপুড়ে বল্লে—এবার আমি যাই।

কালকের টাকা পয়সাগুলো তার হাতে দিয়ে বল্লুম—হ্যা যাও, আর কখনো এমন খেলা খেলো না।

সাপুড়ে বসে বসে পয়সাগুলো গুণে দুটো টাকা আর আর এক মুঠো পয়সা আমার দিকে এগিয়ে বল্লে—এই নাও তোমার বখরা।

কিন্তু তার সেই মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা পয়সা ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হোলো না। আমি বল্লুম—ও আমি নেব না, তুমি নিয়ে যাও।

সাপুড়ে আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—কেন নেবে না?

আমি বল্লুম—ও তুমি নিয়ে যাও, তোমায় আমি দিচ্ছি।

সাপুড়ে এবার অত্যন্ত দুঃখিত হোয়ে বল্লে—আমার উপর নারাজ হোয়ো না বাবু।

—না না, আমি খুশী হোয়ে তোমায় দিচ্ছি।

সে আর কথা না বলে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে রাখলে। তারপর কোণ থেকে বাঁক তুলে কাঁধে ফেলে বল্লে—চল্লুম।

সাপুড়ে চলে গেল। বসে বসে ভাবতে লাগলুম—ওঃ কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি। লোকটা মরে গেলে এরা তো আমায় ঠেঙিয়েই মেরে ফেলত। এদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পুলিশের হাতে গিয়ে মরতে হোতো। বিপদ একেই বলে—

—গোড় লাগে বাবু!

মুখ তুলে দেখি এক বৃদ্ধ সস্মিত মেজে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কে বাবা?

আমি মুসাফের! তোমার পাশের ঘরেই থাকি।

বৃদ্ধ আমার কম্বলে বেশ জাঁকিয়ে বসলে। আমি তাকে বিশেষ আমোল না দিয়ে এদিক ওদিক চাইতে আরম্ভ কোরে দিলুম। কিছুক্ষণ পরে সে বল্লে—বাবু সাহেবের বাড়ী বাংলা দেশে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। তোমার সঙ্গে এসেছিল ব্যাটা চালাকি করতে।

—কার কথা বলছ?

—ঐ ব্যাটা দাগাবাজ, চোর, ঐ সাপুড়েটার কথা।

চুপ কোরে রইলুম। এ কথার আর কি উত্তর দেব! বৃদ্ধ আবার সুরু করলে—বাবু এ বিদ্যে আপনি কতদিন শিখেছেন?

আমার হাসি পেল। বল্লুম—বেশীদিন নয়। এই পরশু সন্ধ্যেবেলা।

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ হেসে ফেল্লে। সে আবার কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি বুঝি মেলা দেখতে এসেছ?

সে বল্লে—না বাবু আমরা শহরে চলেছি। এখানে মেলা হচ্ছে, কিছু রোজগারের জন্য দু-দিন সবুর করেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি কর তুমি?

সে বল্লে—আমরা গায়ক। শহরে ও মেলায় গান গেয়ে পয়সা রোজগার করি। ছ'মাস ঘরে থাকি ও চাষবাস করি আর ছ মাস ঘুরে বেড়াই গান গেয়ে গেয়ে।

এ শ্রেণীর লোক এর আগেও আমি অনেক দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার স্ত্রী সঙ্গে আছে তো?

সে বল্লে—হ্যাঁ আছে।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাশের ঘরে একটি যুবতীকে দেখেছিলুম। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ যুবতীটি বুঝি তোমার স্ত্রী?

সে বলে যেতে লাগল—তার দুই বিয়ে। বড় স্ত্রী ছেলে পিলে নিয়ে বাড়ীতেই থাকে, আর তার বয়স হয়েছে বেশী ঘুরতেও পারে না। কাজেই তাকে আবার বিয়ে করতে হয়েছে।

সে আরও অনেক দুঃখের কাহিনী জানিয়ে বল্লে—

তোমার মত যদি কোনো গুণ জানা থাকত তা হোলে এত কষ্ট পেতুম না।

মনে হোলো বলি—তা হোলে বৃদ্ধ বয়সে ফাঁসি হোতো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ কোনো কথা বল্লে না। বিমর্ষ হোয়ে বসে রইল। আমি তাকে বল্লুম—দেখ ভগবান তোমায় যা গুণ দিয়েছেন তাতে বনের পশু বশ হয়। তুমি দুঃখ কোরো না, তুমিও গুণী।

বৃদ্ধ বল্লে—কিন্তু এ গুণে আমার পেট ভরে না। তুমি সাধু লোক তুমি যদি একটু দয়া কর—

আমার কি আছে বাবা! আমি গরীব তোমার চেয়েও গরীব।

বৃদ্ধ এবার একটু হেসে বল্লে—তোমার কাছে যা আছে তার একটি কণাও যদি আমায় দাও; তা হোলে—

অবাক করলে! কি চায় এ বৃদ্ধ আমার কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি চাই তোমার বল, আমার সাধ্য থাকলে দেব।

এবার সে একটু প্রফুল্ল হোয়ে বল্লে—তোমার গুণ আমায় শিখিয়ে দাও। বেশী না, একটুখানি।

বৃদ্ধ আমার হাত চেপে ধরে কাতরস্বরে বলে যেতে লাগ্‌ল—তোমার ভাল হবে—আমি বল্‌ছি তোমার ভাল হবে। ঘরে আমার বাচ্চারা রয়েছে তাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।

তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। এখন এ থেকে উদ্ধার পাই কি কোরে তাই ভাবতে লাগলুম। এ দিকে বৃদ্ধের কান্নার বেগ বেড়েই চলেছে। শেষকালে তার হেঁচ্‌কি উঠ্‌তে আরম্ভ করলে। তার মুখ দেখে আমার ভয় হোতে লাগ্‌ল—এও কি সাপুড়ের মতন দাঁত খিঁচিয়ে পড়বে নাকি!

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লুম—দেখ এ বিদ্যে গৃহস্থকে শেখাতে মানা আছে। তুমি যাও আমি এখন বেরুচ্ছি।

বৃদ্ধ ওঠেনা। শেষকালে তার হাত ধরে বের কোরে দিয়ে তখনকার মতন আত্মরক্ষা করলুম।

মেলায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে অবধি কাটিয়ে ঘরে এসে রান্না চড়িয়েছি এমন সময় মিঠে সুরে ডাক এল—বাবু সাহেব!

—কে!

মুখ তুলে দেখি সেই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা চৌকাঠের কাছে দরজাটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বল্লুম—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

তরুণী যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনি অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্কোচে তার পা উঠ্‌ছিল না। আবার বললুম—এস, এস, দাঁড়িয়ে কেন। বস।

এবার সে ভয়ভঙ্গুর ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি রান্না হচ্ছে?

মনে মনে বল্লুম—তোমাদের মুণ্ডু। প্রকাশ্যে বল্লুম—খিচুড়ী। খাবে?

না—বলে সে কম্বলের ওপরে ধপাস্ কোরে বসে পড়্‌ল।

বল্লুম—খাও না। বেশ রান্না হয়েছে।

সে বল্লে—না, তোমরা মাছ খাও।

—কে বলেছে?

আমার স্বামী।

বোঝা গেল যে, আমার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাদের আলোচনা হয়েছে। এটাও বুঝতে পারলুম, রাত্রে আমার ঘরে এসে এই যে ভাব জমাবার চেষ্টা এর মধ্যে অনেকখানি সেই বুড়োর কারসাজি।

মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা হিসাব-নিকাশ করছি এমন সময় তরুণী বলে উঠ্‌ল—খুব জব্দ কোরে দিয়েছিলে তুমি সেই সাপুড়েটাকে।

এই কথা বলে সে হাসতে লাগ্‌ল। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে সে কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল।

আমি উনুনের ধারে বসে মজা দেখতে লাগলুম। তরুণী কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বস্‌ল, তখনও তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। সকাল বেলা স্বামী

এসে কাঁদতে সুরু করেছিল, রাত্রি বেলা স্ত্রী এসে হাসতে সুরু করলে—ব্যাপার কি! আমি উনুনের কাছ থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কাছে আসতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। সুন্দর তার মুখ কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটি। অমন কালো আর অমন পরিষ্কার চোখ আমি আগে দেখি-নি। সেই স্বচ্ছ চোখ দুটোর ভেতর দিয়ে তার অন্তরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম—জব্দ যে যার নিজের দোষেই হয়, কে কাকে জব্দ করতে পারে।

এবার সে আর কোনো ভণিতা না কোরে একেবারে বলে ফেল্লে—বাবু, তোমার বিদ্যে আমায় একটু শিখিয়ে দাও না।

এইটেই আমি আশা করছিলুম। বল্লুম—মেয়েমানুষে এ বিদ্যে শিখতে পারে না।

সে বল্লে—তবে আমার স্বামীকে শিখিয়ে দাও।

—না, তাকেও শেখাব না।

তরুণী কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। আমি বল্লুম—এবার তুমি যাও। আমি খাব।

—তা খাও না

—না, কারুর সামনে আমি খাই না।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে উঠে চলে গেল।

তরুণীকে যে তার স্বামীই পাঠিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কি কথা হয় তা শোনবার জন্য আমি আস্তে আস্তে তাদের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আসবার আগে বোধ হয় দু-একটা কথা হোয়ে গিয়েছিল। শুনলুম তরুণী বল্‌ছে—মেয়েমানুষের এ বিদ্যে হয় না।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে শেখাবে না?

তরুণী বল্লে—সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিছুতেই শেখাতে চায় না।

বুড়ো বল্লে—আবার যাবি, কিছুতেই ছাড়িস্‌-নি। দেখ্‌ব তুই কেমন বাহাদুর।

তরুণী কিছু না বলে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান সুরু করলে।

বুড়ো বল্লে—গান থামা। আমার কথা বুঝতে পারলি? কাল গিয়ে যেমন কোরে হয় রাজী করাবি।

তরুণী বল্লে—আচ্ছা, সে আমি ঠিক কোরে নেব

ঘরে ফিরে এসে মতলোব আঁটতে লাগ্‌লুম, কালই এস্থান থেকে লম্বা দিতে হবে। বেশী দিন থাকলে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া মুস্কিল হবে। পরদিন সকালে আসন তুলে সরাই থেকে সরে পড়বার মতলোব করছি এমন সময় একমুখ হাসি নিয়ে তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুক্‌ল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি অত হাসি কিসের?

সে বল্লে—আমার স্বামী মেলাতে গেছে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলুম।

—বটে, এস ভেতরে এসে বস।

কম্বলটা আবার বিছিয়ে দিলুম। তরুণী তার ওপরে বসে বল্লে—কোথাও বেরুবে নাকি?

বল্লুম—হ্যা, অনেকদিন হোয়ে গেল, এবার যেতে হবে।

তরুণী বল্লে—এরি মধ্যে কোথায় যাবে? মেলা আগে শেষ হোয়ে যাক্‌, আমরাও চলে যাব, তুমিও চলে যেও।

—সে তো অনেক দিন! অতদিন থাকা আমার চল্‌বে না।

তরুণী এবার একটি চোরা কটাক্ষ হেনে বল্লে—তবে যাবার আগে তোমার বিদ্যা আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও?

ভাগ্যে আমার কোন বিদ্যাই ছিল না, তা না হোলে সমস্ত বিদ্যার বোঝা তখুনি সেই অতল কালো আঁখি-সমুদ্রের কূলে নামিয়ে দিতে হোত। বিদ্যা নেই বলে একবার আফশোষও হোলো, কিন্তু তখুনি মগজটাকে ঠিক কোরে তরুণীকে বল্লুম—দেখ, তোমার স্বামী তোমার ওপর অত্যাচার করে?

একটি চালেই তরুণী মাৎ! তার ছলছলে চোখ দুটো মুহূর্ত্তের মধ্যে সজল হোয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—মারে বাবু, বড্ড মারে।

—তুমি আবার তোমার স্বামীকে এই বিদ্যা শেখাবার কথা বল্‌ছ! একবার শিখলে আগে সে তোমার ওপরে প্রয়োগ করবে। দেখেছ তো সেই সাপুড়ের অবস্থা!

আমার কথা শুনে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বল্লে—ঠিক বলেছ তুমি, তা না হোলে তার এ বিদ্যা শেখবার কি দরকার!

আমি বল্লুম—আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, সাপ কত রকমের জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হয়, এ বিদ্যা জানা থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়।

তরুণী এবার সরে বসে মিনতির সুরে বল্লে—বাবু সাহেব, কক্ষনো তুমি ওকে শিখিও না। তা হোলে আমার আর রক্ষা থাকবে না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম—ক্ষেপেছ তুমি! নিশ্চিন্ত থাক, আমি ওকে কিছু শেখাব না। তরুণী তার ডান হাত থেকে আঁচলটা তুলে একটা দাগ দেখিয়ে আমায় বল্লে—এই দেখ মারের দাগ।

বল্লুম—আহা, বুড়োটা ভারী পাজি তো! সহানুভূতির কথা শুনে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—বাবু, তুমি আমায় নিয়ে চল। আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব। যা করতে বলবে তাই করব—শুধু আমায় মেরো না।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে আবার বল্লে—চল বাবু; বুড়ো নেই এই বেলা চল।

প্রমাদ গুণতে লাগলুম! এ যাত্রায় দেখছি একটা সাংঘাতিক কিছু না ঘটে আর যায় না। যেদিকে তাকাই সেদিক থেকেই একটা না একটা বিপদ এসে হাজির হয়।

সে আবার বল্লে—নিয়ে যাবে আমায়?

তার মন ভোলাবার জন্য বল্লুম—গাইতে পার? সে বল্লে—পারি।

—একটা গান শোনাও না!

বলা মাত্র একবার গলা খাঁকরী দিয়ে গান সুরু করলে।

সুন্দর তার গলা। আর কি অবলীলায় সে গাইতে লাগল। সে গানের ভাষা এখন আর মনে নেই, তবে তার ভাব হচ্ছে—যমুনার দুকূল ভরে মেঘের গায় ছায়া নেমেছে। দেবকীর কালো ছেলে সেই অন্ধকারে আত্ম-গোপন কোরে বাঁশী বাজাচ্ছে। রাধার কানে সে আকুল আহ্বান গিয়ে পৌঁচচ্ছে, বাইরে যাবার জন্য তার মন উতলা হোয়ে উঠেছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; পৃথিবীতে কেউ কোথাও নাই, মিলনের এমন অবসর আর হবে না। কিন্তু রাধা যে পথ দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুবে সেই পথেই তার গুরুজন বসে রয়েছে, কেমন কোরে সে অগ্রসর হবে।

গানের প্রতি কথায় সে কি দরদ, কি আকুলতা!

গান চলেছে এমন সময় তার স্বামী এসে উপস্থিত হোলো। স্বামীকে দেখে তরুনী গান থামিয়ে ফেল্লে।

আমি বল্লুম—থামলে কেন?

তরুণী যেমন হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়েছিল তেমনি হঠাৎ গান সুরু করলে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারা যেতে লাগল, এ যেন সে গান নয়। গানের মধ্যে সে দরদ আর সে আকুলতা নেই। একটা দম-দেওয়া-মানুষ-পুতুল যেন গেয়ে চলেছে।

গান থেমে গেলে একটা সিকি তাকে দিয়ে বল্লুম—এই নাও, তোমার গান শুনে আমি বড় খুসী হয়েছি।

সিকিটা তখুনি সে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে—আমি পয়সা চাই না, তোমাকে খুসী করতে পেরেছি, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বৃদ্ধকে বল্লুম—তোমার স্ত্রীর গলা ভারি মিষ্টি, বেশ গান গায়।

বৃদ্ধ বল্লে—মন দিয়ে তো শেখে না, তা হোলে ও এর চেয়ে ঢের ভাল গাইতে পারত। আমার বড় স্ত্রীর বয়স ওর চেয়ে দশ বছর বেশী হবে কিন্তু সে ওর চেয়ে ঢের ভাল গায়।

আমি বল্লুম—ও!

বুড়ো উঠতে উঠতে বল্লে—বাবু, আমার ওপর দয়া হোল না?

তার কথার কোনো উত্তর দিলুম না দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

কম্বলটা গুটিয়ে রাখছিলুম, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বুড়োর চীৎকার শুনতে পেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনি সে তার স্ত্রীকে বলছে—যা পয়সা নিয়ে আয়। তরুণী কিছু বল্লে না। বুড়ো বলতে লাগ্‌ল—ভারি বদমাইস! এত কোরে বল্লুম কিছুতেই শোনালে না। ওর সঙ্গে আবার খাতির কিসের! যা এক্ষুণি যা।

সেখান থেকে সরে এলুম। একটু বাদেই তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুকল। প্রথমে আমি কিছু বল্লুম না। সে এসে দরজাটি ধরে চুপটি কোরে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম সঙ্কোচে সে লাল হোয়ে উঠেছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। অবস্থাটা সরল করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম— কি?

সে বল্লে—কিছু না! আজ রান্না করবে না?

—না আজ আর রাঁধবো না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে চ'লে যাবার উপক্রম করছে দেখে আমি বল্লুম—তোমার পয়সা নিয়ে যাও।

—পয়সা!—তোমার কাছ থেকে আমি পয়সা নেব না।

—কেন?

—পয়সার জন্য তো গান শোনাই নি।

এবার বল্লেম—না তোমায় নিতেই হবে।

সে জোর কোরে বল্লে—না আমি নেব না।

এর পরে আর কিছু বলতে পারলুম না। সে বল্লে—দেখ তুমি যে চলে যাবে বলেছিলে তা এক্ষুণি যাও না।

—কেন?

এ কেনর জবাব সে দিল না বটে কিন্তু আমি তারা মনের কথা বুঝতে আমার দেরী হোলো না। কম্বলটা গুটোনই ছিল তখুনি সেটা বগলে নিয়ে উঠে পড়লুম। যাবার সময় আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে—আমায় মনে রেখো।

শরাই থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তা ধরে উত্তর-মুখো পা চালিয়ে দেওয়া গেল। লোকে বল্লে—এই পথ একেবারে দিল্লী অবধি গিয়েছে। জনহীন ধূসর পথ। দু'পাশে জঙ্গল, কোথাও নিবিড় কোথাও ফাঁকা ফাঁকা। এরই ভেতর দিয়ে আমার মন ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে মনেরই অজানা কোন্ স্থানে। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। দূরের আব্ ছায়াগুলো অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে আমার চার পাশে এসে জমতে লাগ্‌ল। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টির জল আমার রৌদ্র দগ্ধ তপ্ত দেহের ওপর পড়ায় চম্‌কে উঠলুম। ওপর দিকে চেয়ে দেখি চির-বিরহী আকাশের নয়ন অশ্রু সজল হোয়ে উঠেছে। আমার মনে পড়ল পেছনে ফেলে-আসা সেই তরুণীর কথা, তার সেই অশ্রু সজল কালো চোখের কথা—যার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই অথচ এই চির-বিরহের ছলে যার সঙ্গে চির-মিলন হোয়ে রইল তার কথা।

চারিদিককার এই আলো-আঁধারের আবছায়া ভেদ কোরে তারই মৃদু কণ্ঠ আমার কানে এসে বাজতে লাগ্‌ল—আমায় মনে রেখো।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে—প্রেম

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মূলমন্ত্র, মানুষের অন্তরটি সীমাহীন আত্মার আসন, অর্থাৎ প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই ভগবান বাস করেন। তিনি একস্থানে বলিতেছেন—

> "মানুষের অন্তর· জিনিষটাকে চিনিয়া লইয়া তাহার বিচারের ভার অন্তর্য্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন; নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন আমি তেমন, একাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না... আমি ত লজ্জায় বাঁচি না।···কবিকে ছাপাইয়া কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়।···মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত সে কি একটা মুখের কথা! দম্ভ প্রকাশের বেলায় কি তার কাণাকড়িও মূল্য নাই! তোমার কোটি কোটি জন্মের অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তোমার ভুয়ো দর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটি কি একটি বারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না যে, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!"

এই কয়টি কথায় খুবই বুঝিতে পারা যায়, মানুষ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা কতখানি। মানুষ যে অবস্থার দাস, কার্য্য-কারণসম্বন্ধে যে তার হাত নাই এবং তার অন্তর জিনিষটা যে অতি বিচিত্র এই সত্য তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই কোন মানুষকেই, যত হেয় অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, তিনি ছোট বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। তার চরিত্রের কোন একটি বিশিষ্ট দুর্ব্বলতাই যে তার সমগ্র পরিচয় নয়, এই সত্যের প্রমাণ তাঁর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাই। বিশেষ করিয়া তিনি নারী সম্বন্ধে কোন ছোট ভাব পোষণ করিতে পারেন নাই। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—

> "স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাহাদের?...তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ যখন খুসী ফেলিয়া...সতীর আসনে গিয়া বসিতে পারে!"

এই যে দুচারিটা কথায় তাঁর সমস্ত অন্তরটা আমরা দেখিতে পাইলাম, ইহার মধ্যে তাঁর সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও সার্থকতা নিহিত আছে। এ কয়েকটি কথায় তাঁর যে শ্রদ্ধা, যে সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিকের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। প্রত্যেক চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে যেখানে দরদ নাই, যেখানে চরিত্রগুলিকে বৃহত্তর মানবতার দিকে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টি বৃথা।

একটু অবান্তর হইলেও একটা সত্য এখানে বলিয়া রাখা সমীচীন বোধ করি, কারণ এ সত্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে বুঝিবার অনেক সুবিধা পাওয়া যাইবে। অনেকে মনে করেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বুঝি বাস্তব জগতের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ তিনি একজন Realist—বস্তুতান্ত্রিক।

একথা আমি স্বীকার করি না। স্কট-এর সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"His (Scott's) comprehensive power, which drew with the same certainty so many characters in so many various classes, was the direct result of his ***profound sympathy*** with the simpler feelings of the human heart and of his pleasure in writing so as *to make human **life more beautiful and more good*** in the eyes of men. (So) He was always ***romantic***."

শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি চরিত্র এত বেশী তাঁহার দরদ বা সহানুভূতি পাইয়াছে যে, তাহাদিগকে বাস্তব বা Real বলা চলে না। এই বাধা, দ্বন্দ্ব, নীচতা ভরা মানবজীবনকে তাহারা বৃহত্তর মানবতার দিকে লইয়া গিয়ে মুক্তি ও আনন্দের সন্ধান দিতে আসিয়াছে। অথচ শরৎচন্দ্রকে আদর্শবাদী (Idealist) বলা চলে না বরং তাঁহাকে Semi-realist বা Semi-idealist বলা যাইতে পারে। তার কারণ শরৎচন্দ্র বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার কল্পনা, তাঁহার সহানুভূতি বাস্তবকে লইয়াই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সাবিত্রী, রমা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি এই ধরারই মেয়ে কিন্তু তাহারা প্রতিনিয়ত স্বর্গের পানে চলিয়াছে। মিথ্যা, দম্ভ, সঞ্চয় ও বন্ধনের বাহিরে যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, যাহার আকাশ সীমাহীন পরিব্যাপ্ত, যেখানে সমাজের ভ্রূকুটি নাই, যেখানে আশা আকাঙ্ক্ষার বেদনা নাই, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাহারই সন্ধান দেয়।

বস্তুতঃ কোন সাহিত্যেরই বাস্তব চরিত্রের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হওয়া উচিত নয়; তাহার জন্ম আছে ইতিহাস, তাহার জন্ম আছে ফোটোগ্রাফি। বস্তুর মধ্যে যে অবস্তুর অস্তিত্ব, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ সাহিত্য তারই প্রতিচ্ছবি। তাজমহলের ফোটোগ্রাফ রাখে ইতিহাস, তাহার কয়টা মিনার আছে, কয়টা কবর আছে সে নিখুঁত করিয়া গণিয়া রাখে কিন্তু তাজমহলের অন্তরটিকে দেখে কবি—তাহার বস্তুপিণ্ড তুচ্ছ হইয়া কবির কাব্যে সে একটি বিশ্বব্যাপ্ত বিরহের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের কিন্তু বস্তুকেও উপেক্ষা করা চলিবে না। বাদ্য যন্ত্রের প্রাণ সাতটি সুরের মধ্যে থাকিলেও কল-কব্জাগুলিকে ঠিকমত ঠিক জায়গাতেই বসাইতে হয়। তাজমহলের গঠনপ্রণালী যদি অত সুন্দর না হইত তাহা হইলে কবির কাব্যে তাহার অন্তরটি কি তেমন করিয়া ধরা পড়িত? রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বোধ করি এই সুরটাই বার বার ধরা পড়িয়াছে। তাই তাঁহাকে Semi-realist বলিতেছিলাম।

সাহিত্য Realistic হওয়া উচিত কি Idealistic হওয়া উচিত, তাহার সার্থকতা কোথায় এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, শরৎচন্দ্র যে ক'টি রত্ন আমাদের উপহার দিয়াছেন তাহাদিগকে পাথর বা কয়লা বলিয়া তুচ্ছ করিবার অজ্ঞতা হয় ত আমাদের কখনও হইবে না এবং যে জিনিষ-টার বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আমরা এই রত্নগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহাকেও বোধ হয় ভুল বুঝিবার হাত হইতে আমরা নিস্তার পাইব। সে বিচিত্র জিনিষটি হইতেছে প্রেম।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রেম একটি অভিনব মূর্ত্তি পরি-গ্রহণ করিয়াছে। সেই সীমাহীন আত্মাই যে প্রেম এবং সেই যে মানুষের অন্তরে বসিয়া তাহাকে বিচিত্ররূপে ব্যক্ত করিয়া বৃহত্তর মানবতার দিকে লইয়া চলিয়াছে, এই বোধ করি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। Love is God—এই তাঁহার সাহিত্যে যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। প্রেম যে শান্তম্ শিবম্, অদ্বৈতম্, তাহা যে দেহ বা ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার যে কোন কামনা নাই, বাসনা নাই এই সত্যটাই যেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে উপলব্ধি করি। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, রমা, পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি যে প্রেমের এই তাপসী মূর্ত্তির সন্ধান দেয় একথা বোধ করি বড় গলা করিয়াই বলা চলে। এখানে ইন্দ্রিয় যেন অতীন্দ্রিয়ের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

মিলনই যে প্রেমের সবচেয়ে বড় সার্থকতা নয়, বিরহ বা ত্যাগের মধ্যেও যে সে অভিনব হইয়া উঠে একথা শরৎচন্দ্র খুব বেশী অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই

তিনি ট্রাজেডির পর ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীকান্তের প্রথমপর্ব্বের উপসংহারে যেখানে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়াছে সেখানে এই কথাটাই শুনিতে পাই—

> "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্নেহস্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য আমাকে আজ এক পদও নড়াইতে পারিত।"

প্রেম সাহিত্যের একটি অমূল্য বস্তু, কত কবি ইহার কতরূপে বন্দনা গাহিয়াছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র যে ভাবে ইহার আরাধনা করিয়াছেন তাহা অভিনব। আমরা তপস্যা করি ভগবানের সহিত বৃহত্তর মিলনের জন্য। তাহাতে আমার বলিয়া যাহা কিছু সমস্ত বিসর্জ্জন দিই, এমন কি এই দেহটা পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ প্রেমও যে একটা তপস্যা, প্রেমিককে সব ত্যাগ করিয়া তাহার 'আমি'টিকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয় সাবিত্রী আমাদিগকে সেই কথাটাই বলিয়া দেয়। বাহিরের দিক হইতে সতীশ ও সাবিত্রীর বিচ্ছেদ যত বড়ই হোক অন্তরে অন্তরে তাহাদের মিলন যে অনেক দিন হইতেই হইয়া গিয়াছে, এ কথা বোধ করি মিথ্যা নয়। সাবিত্রীকে এই মিলনের জন্যই তিলতিল করিয়া নিজেকে ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে হইয়াছে; বস্তুতঃ সতীশের আত্মার সহিত এই যে তার মিলন ইহা ত তাহার ভগবানকেই পাওয়া।

প্রেমের এই যে এত বড় সার্থকতা, এই যে বৃহত্তর প্রকাশ, ইহা উপলব্ধি করিয়া মনে হয়, এ প্রেম যেন এ জগতের নয়। কিন্তু যখন উপলব্ধি করি প্রেমের এই অভিনব মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে, ইহার সার্থকতার উপলব্ধি করিয়াছে সাবিত্রী, তখন মনে হয় বস্তুর মধ্যেই যে অবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র এই কথাটাই যেন বারে বারে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। সমাজের চোখে, নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, প্রভৃতি যে বস্তু-বিশেষ, তাহাদের যে প্রাণ নাই, অনুভূতি নাই একথা বোধ করি মিথ্যা নয়। সাবিত্রী যে ভালবাসিতে পারে, তাহারও মধ্যে যে নির্ম্মল নারীত্ব আছে একথা যখন কেহ ভাবিতে পারে নাই, ঠিক তখনই তাহার মধ্যে শরৎচন্দ্র এমন একটা বস্তু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা শুধু নারীত্বের আসনেই নয়, সতীত্বের আসনেও তাহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানটি না দিয়া পারে না। সাবিত্রীর যে প্রেম তাহা সাবিত্রীর মধ্যেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। পঙ্কেই যে পদ্মফুল ফোটে এবং কালোর মধ্যেই যে আলো বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এ ত অতি সাধারণ উপমা।

সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর কাহিনীর মধ্যে যখন আমরা লুপ্ত হইয়া যাই তখন এই কথাটা মনে হয়, কই, তাহাদের পতিতা বলিয়া ত একবারও মনে হয় না। মনে হয়, এমনি শত শত রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী আজ যদি আমাদের ঘেরিয়া থাকিত ত আমরা ধন্য হইয়া যাইতাম। কেহ হয় ত বলিবেন, তবে কি তুমি বলিতে চাও, তাহারা সতী? তুমি কি শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির পাশে সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীর আসন পাতিতে চাও? তুমি কি ভুলিয়া গেলে কবে কোন্ "উচ্ছল যৌবনের বসন্ত দিনে" রাজলক্ষ্মীর নাম কেন 'পিয়ারী' রাখা হইয়াছিল; সাবিত্রীই প্রেমের যত তপস্যা করুক সেও ত একদিন কত মিথ্যা প্রেমের মেলা পাতিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত ইহাও ত সত্য যে তাহারা বিধবা। সব মানিয়া লইলাম, তাহারা যে বিধবা, তাহাদের অতীত যে নির্ম্মল ছিল না, এ সবই সত্য কিন্তু তবুও তাহারা অসতী নয়। এ সত্য যদিও যুক্তিহীন নয়, তবু ইহাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হয়। তবে এই টুকুই বলিয়া রাখি, সতীত্বকে কোন বিশেষ নীতির আদর্শ দিয়া যাচাই করা চলে না। সতীত্ব নারীর প্রধান ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম কোন বিশেষ অবস্থায় নারীর একচেটিয়া নয়। তবে সতীত্বকে যদি কোন জিনিষ যাচাই করিতে পারে তাহা হইতেছে প্রেম ও নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা ও প্রেম সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে বলিয়াই তাহারা সতীপদ বাচ্যা।

একথা খুব সত্য যে, মানুষ যত মন্দই হউক না কেন তাহার ভাল হইবার পথ খোলাই থাকে এবং এই পথ বাহিয়া যখন সে উপরে আসিতে চায় তখন তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর অতীত যাহাই হোক না কেন, যে দিন হইতে তাহারা সত্য ভাবে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে সে দিন হইতে তাহাদিগকে আর অশ্রদ্ধা করা চলে না কিন্তু এই ভালবাসা যেদিন হইতে রক্ত মাংসের গণ্ডী ছাড়াইয়া সীমাহীন আত্মার সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে সেদিন রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রী শুধু সতী নয় তাহারও উপরে।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতির চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া একটা জিনিষ বড় অদ্ভুত মনে হয়।—তাহারা পরবর্ত্তী জীবনে অতি পূতভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিলেও তাহারা যে মন্দ তাহারা যে পতিতা এই কথাটা একদিনের তরেও ভুলিতে পারিল না। যে সাবিত্রীকে উপেন্দ্র বলিতেছেন,—

> "এ সব আসক্তি নিরাসক্তি তোমার নয় দিদি, তুমি তার অনেক উপরে।" সেই সাবিত্রীর মুখ দিয়াই আবার যখন শুনি—"আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ তিনি বুঝেছেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।...তাঁকে মিথ্যে দোষারোপ করে আপনাকে হীন কোর না, ভগবানের পায়ে অপরাধী হয়ো না।"

তখন শুধু চোখেই জল আসে না, চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—সাবিত্রী তুমি ত মানুষ নও তুমি দেবী, তাই তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন হীন ভাব পোষণ করিতে পার কিন্তু আমরা পারি না।

বিদায় কালে সতীশ যখন সাবিত্রীকে ছাড়িতে চাহিল না—জিদ ধরিয়া বলিল, উপীন-দাই বলেছেন, তুমি সংসারে কারো চেয়ে ছোট নও—এই সত্য কথা।

উত্তরে সাবিত্রী বলিতেছে—

> "না তা নয়...তুমি বলবে সত্য হোক, মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে তোমাকে চাই। কিন্তু আমি তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি। কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তাঁর সম্মানের আসনটি দেয় না, কেবল স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন।"

সতীশের এ সব কথা বুঝিবার শক্তি নাই, সে অধৈর্য্য হইয়া বলিল—

> সাবিত্রী, আজ তুমি আমাকে ছুঁয়ে এই সত্যটা সোজা করে বল, তুমি আমাকে ভালবাস কি না।
>
> সাবিত্রী সজল নেত্রে কহিল—ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? ওগো, তাইত তোমাকে চিরকাল এত দুঃখু দিলুম কিন্তু কিছুতেই এই দেহটা তোমাকে দিতে পারলুম না।"

ত্যাগের ক্ষেত্রে সাবিত্রীর সহিত পল্লীসমাজের রমার যেন কোথায় মিল আছে। উভয়েই প্রেমের পায়ে নিজেকে শুদ্ধ বলি দিতে বিমুখ হয় নাই। তাহাদের প্রেম প্রেমাস্পদকে একবারও কাছে টানিবার চেষ্টাও করে নাই—শেষ পর্য্যন্ত দূরেই ঠেলিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের প্রেমের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য এই খানে যে, তাহারা জীবনপাত করিয়াও তাহাদের ভালবাসাকে বরাবর গুপ্তধনের মত ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, রমা বা সাবিত্রী সমাজকে ভয় না করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। এটা তাহারা বুঝিয়াছে যে, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুধু ত নিজের জীবনকেই তিক্ত করিয়া তোলা নয়, তাহাদের প্রেমাস্পদকেও যে সেই সঙ্গে বিপন্ন অবমানিত করিয়া তোলা তাই সাবিত্রী বলিয়াছিল—

> —"সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না, জানি কিন্তু আমি সমাজ চাই। আমি ত তাকে

মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না।...

বিদ্রোহের পথে মিলনের চেয়ে যে শান্তির পথে অবমাননাও শ্রেয় একথা সাবিত্রী জানিত বলিয়াই নিজেরি হাতে সে নিজের অনিষ্ট করিতে ছুটিয়াছে। নিজেকে সে বারে বারে পতিতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

রমার ভালবাসা ঠিক এই ভাবেই মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে। রমেশের ঘৃণার মধ্যে সে তাহার ভালবাসাকে লুকাইতে চাহিয়াছে। এ ঘৃণা তাহাকে যে কি ভয়ানক আঘাত করিয়াছে সে ত আমরা রমাকে তার রোগশয্যাতে দেখিয়াই টের পাইয়াছি কিন্তু তাহাই তাহাকে সারা জীবন ধরিয়া অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, কারণ সে জানিয়াছিল, একটা বিধবাকে ভালবাসিয়া অশান্তিকে ডাকিয়া আনা অপেক্ষা জীবনে অনেক বড় কাজ আছে যাহা পৃথিবী রমেশের কাছ হইতে দাবী করিতে পারে। এই ঘৃণা অর্জ্জন করিবার জন্য রমা তাহার শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রমেশের শত্রু ভাবেই নিজেকে দেখাইয়াছে; এমন কি রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়া তাহার জেলের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। এইখানে রমার দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া একদিকে যেমন বিস্মিত হইতে হয় তেমনি আবার চোখে জল রাখা যায় না। প্রেমের এই যে অদ্ভুত অভিব্যক্তি যাহা একই কালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া ও ধাঁধাইয়া দেয় তাহা কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের সুনিপুণ হস্তেই সম্ভব হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যে প্রেমের অভিব্যক্তি তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া হইলেও ঠিক এই ভাবে নয়। রাজলক্ষ্মী তার ভালবাসাকে কখনও গোপন করে নাই; নিজেকে পতিতা বলিয়া শ্রীকান্তের মন হইতে নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার আগ্রহ দেখায় নাই বরং পিয়ারী বলিয়া ডাকিলে তাহার অভিমানের শেষ ছিল না। তাহার কাহিনীর মধ্যে শ্রীকান্তের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিতেও ত কই দেখি নাই। এমন কি শ্রীকান্ত যেখানে কোন বাগদত্তার সহিত তার বিবাহের সংবাদ দিতেছে সেখানে সে সুখী হয় নাই। এই সব উদাহরণের জন্য কেহ যেন মনে করেন না যে, আমি রাজলক্ষ্মীকে ছোট করিয়া ভাবিতেছি। আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, তাহার প্রেম অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা প্রেমাস্পদকে দূরে ঠেলে নাই, কাছেই টানিয়াছে। কিন্তু মিলনের বিপক্ষে যতখানি ত্যাগ ও বিরহ জমা হইয়াছিল তাহার মূলে শ্রীকান্তের সামাজিক কল্যাণের চেয়ে রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বের বাধাই বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সাবিত্রীর বাধা সে কুলত্যাগিনী, যেখানে রমার বাধা সে বিধবা, সেখানে রাজলক্ষ্মীর বাধা সে বঙ্কুর মাতা। রাজলক্ষ্মী এই মাতৃত্বকেই অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বার বার শ্রীকান্তকে সরাইয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয়, শ্রীকান্ত নিজেই সরিয়া আসিয়াছে বার বার। অবশ্য সমাজের ভয়ে, কেননা সাবিত্রী রমার মত প্রেয়সীর মঙ্গলের জন্য তাহার ঘৃণা অর্জ্জন করিবার মত ভালবাসা ও উচ্চতা শ্রীকান্তের ছিল না। এখানে শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই। পুরুষ চরিত্রের উপর কেন যে তাঁহার সহানুভূতি কম তাহা ভাবিয়া পাই না। তবে বোধ হয় শ্রীকান্তকে তিনি realistic করিতে গিয়াছেন।

> "পিয়ারী বলিল—বঙ্কুর বিয়ের তো এখনো দেরি আছে, চল না আমিও একবার প্রয়াগে স্নান করে আসি।
>
> শ্রীকান্ত একটু মুস্কিলে পড়িয়া চুপ করিল। পিয়ারী তাহার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল—আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?
>
> অপ্রতিভ হইয়া শ্রীকান্ত কহিল—বাস্তবিক দুর্নাম জিনিষটা এমনি যে, লোকে মিথ্যা দুর্নামও ভয় না করে পারে না।

শ্রীকান্তের মুখে এ কথা আমরা আশা করি নাই। ভাবিয়াছিলাম বৈষ্ণব-কবির মত সেও বুঝি বলিবে—তোমার লাগিয়া কলঙ্ক পসরা মাথায় বহিতে সুখ। শ্রীকান্তের ন্যায় এমনি একটা কথা সাবিত্রীও সতীশকে বলিয়াছিল—

"—লেখাপড়া ভাল লাগচে না? এখন ভাল লাগচে বুঝি মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করা?

সাবিত্রীর এই কটূক্তির মধ্যে অশ্রু আছে, শ্রদ্ধা আছে কিন্তু শ্রীকান্তের ঐ বাক্যের মধ্যে আছে শুধু কাপুরুষতা ও অশ্রদ্ধা। কিন্তু ঐ বাক্যই গভীর শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হইতে পারিত যদি বুঝিতাম, শ্রীকান্তের সঙ্কল্প এই যে, সামান্য মিলনের মোহে উচ্চতর মাতৃত্বের সিংহাসন হইতে রাজলক্ষ্মীকে কিছুতেই নামানো চলিবে না; কিন্তু অত খানি বড় হইবার সৌভাগ্য শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে সাবিত্রী রমাই পাইয়াছে, শ্রীকান্ত পায় নাই—সেটা তারই দুর্ভাগ্য।

যদিও শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্ব্বের উপসংহারে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মিলন ঘটাইয়াছেন, তবু এক-বারও আমাদের মনে হয় না, তাহাতে রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বের গর্ব্ব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কারণ এ মিলন দেহাতীত কামনাহীন। সাবিত্রী রমা বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া যে বৃহত্তর মিলনের সন্ধান পাইয়াছে রাজলক্ষ্মী বাহিরের মিলনের মধ্য দিয়া সেই একই মিলনের অধিকারিণী হইয়াছে। এই জন্য রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী-রমা অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নহে।

রমা সাবিত্রী রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির চরিত্রে শরৎচন্দ্র প্রেমের যে অভিনব বিকাশ দেখাইয়াছেন তাহাই যে আদর্শ প্রেম তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের এই স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-নীচতা ভরা মানবজগতে রমা রাজলক্ষ্মী যে বেশী নাই এবং রমা রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী নারীর আদর্শ হইলেও অধিকাংশ নারীই যে কিরণময়ী অভয়া এ কথা শরৎচন্দ্র খুব বেশী অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রেমের স্বর্গীয় বা আদর্শ অভি-ব্যক্তির ঠিক পাশেই কিরণময়ীর চরিত্রে প্রেমের অতি সাধারণ বস্তুগত সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা রাজ-লক্ষ্মী সাবিত্রীকে মাথায় করিয়া রাখেন তাঁদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, কিরণময়ীকে তাঁহারা যেন অশ্রদ্ধা না করেন। কিরণময়ী এই জগতেরই ধূলা কাদা মাখা মেয়ে। জীবনে তাহার যথেষ্ট ভুলচুক ছিল সত্য কিন্তু এই ভুলচুকগুলা প্রত্যেক রক্ত মাংসে গড়া মানুষের কাছে ত অসাধারণ নয়। আদর্শ কোন্ জিনিষের না থাকে। প্রেমেরও আছে কিন্তু তাহাতে আদর্শ চিরকাল-টাই কি শুধু সত্য আর তাহার স্বাভাবিক সাধারণ বিকাশটা কি মিথ্যা? শরৎচন্দ্র তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিতে চান, সাবিত্রীর প্রেমও সত্য, কিরণ-ময়ীর প্রেমও সত্য। এই জন্য তাঁহাকে semi-realist বলিয়াছিলাম অর্থাৎ তিনি আদর্শবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক দুই-ই।

এইবার প্রেমের সাধারণ বস্তুগত রূপটা কি তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব। স্বর্গীয় প্রেমে দেহের বাহ্যরূপের স্থান নাই। সেখানে স্থান আছে কেবল অতীন্দ্রিয়ের, পরমা-ত্মার কিন্তু সাধারণ প্রেমে ঐ দুটাই খুব বেশী স্থান জুড়িয়া থাকে। এ প্রেমে কামনা আছে, হিংসা আছে, মান অভিমান আছে। কিরণময়ীর মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র প্রেমের যে আদর্শ দিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকখানি তার দম্ভ থাকিলেও সত্যও যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিরণময়ী দিবাকরকে বলি-তেছে—

"মনে হয় সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সব চেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ।...ঠাকুরপো, ততক্ষণই মানুষের রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করিতে পারে, সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই তার প্রেম।" এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখিতে পায়, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর, আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোন মতেই থামাতে পারে না। কিন্তু মানুষের লোভ দমন করবার শক্তি, স্বার্থ ত্যাগের শক্তি সমাজের শক্তি এত গুলো বিরুদ্ধ শক্তি আছে বলেই চতুর্দ্দিকে এক সঙ্গে আগুন ধরে যেতে পারে না। অথচ এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল—যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসন মানত না। একেই "পৌষীন কাপড়চোপর পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরি হয় কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না চাইনে, স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করব, প্রেমের ব্যবসা অত সোজা নয়।

এক কথায় কিরণময়ী বলিতে চাহিয়াছে, আমাদের এই দৃশ্যমান পার্থিব জগতে কামনাহীন প্রেম নাই কিন্তু সে ত একবারও বলে নাই, কামপূর্ণ প্রেম কামহীন প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ জগতে নয় কিন্তু আর কোন স্থানে, যাহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়:—যেমন স্বর্গে হয় ত কামনাহীন প্রেম আছে। কিন্তু কিরণময়ী ত শরৎচন্দ্র নয়, সে কল্পনা করিতে পারে না। সে এই জগৎটাকেই মানে, এই দেহটাকেই মানে—অতীন্দ্রিয়কে নয়। কিন্তু কিরণময়ী যদি কল্পনা করিতে পারিত সেও হয় ত শরৎচন্দ্রের ন্যায় কামনা হীন প্রেমের সন্ধান পাইত। কিরণময়ী এই পৃথিবীরই ধূলাকাদা ভরা মেয়ে কিন্তু সাবিত্রী রমা রাজলক্ষ্মী কল্পলোকের। কিরণময়ীর যে মত তাহা যেমনি অপ্রিয়, কঠোর এবং সহানুভূতিহীন তেমনি খাঁটি। এই ধরার ভুলচুক ভরা মানুষগুলিকে যাচাই করিবার এমন উৎকৃষ্ট মন্ত্র কি সাবিত্রী-রমার প্রেমের মধ্যে পাওয়া যায়?—যায় না! এই জন্য কিরণময়ীর চরিত্রে আমরা অস্বাভাবিকতা কিছুই দেখি না। মানুষ যতটুকু পর্য্যন্ত ছোট হইলেও পশু হইয়া যায় না মানুষই থাকে, কিরণময়ী হয়ত ততটাই নামিয়া গিয়াছিল—তার বেশী নয়। কিরণময়ী কেন রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, রমা হইল না এই অনুযোগের দোহাই যাঁহারা পাড়েন তাঁদের বলা যাইতে পারে যে, কিরণময়ী শুধু যে এই ধরারই মেয়ে তাই নয়, সাবিত্রীরমা, হইবার সুযোগ সে পায় নাই—পাইলে হয় তহইত। উপেন যদি কিরণময়ীকে ভালবাসিত তাহা হইলে কিরণময়ীর হয় ত অত শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না। শ্রীকান্ত যদি রাজলক্ষ্মীকে না ভালবাসিত সতীশ যদি সাবিত্রীকে ভাল না বাসিত কে বলিতে পারে তাহারাও এক একটি কিরণময়ী হইয়া উঠিত কি না! তাই সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর সহিত একই তুলাদণ্ডে কিরণময়ীর দাম ঠিক করা চলে না—শ্রীকান্তের অভয়ারও নয় তার কারণ অভয়াই দিতেছে—

> "অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, এরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েছি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি।…এদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই, শ্রীকান্ত বাবু।"

কিরণময়ীর জীবনেরও এদের সহিত কোথাও মিল নাই।

অভয়ার চরিত্র আলোচনা এ প্রবন্ধে অবান্তর হইবে। কেননা তাহার জীবনের যে সমস্যা তাহা প্রেমের দিক দিয়া নয়। সতীত্ব অসতীত্ব, অধিকার অনধিকার, অত্যাচার অনাচার প্রভৃতির সমস্যায় তাহার জীবন পরিপূর্ণ। যদি বুঝিতাম সে স্বামীকে চায় না, রোহিনীকে চায়। তাহার সমস্ত ভালবাসা রোহিনীর পায়েই উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে; যদি বুঝিতাম যে রোহিনীর সহিত তাহার মিলন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে অভয়ার চরিত্র এ প্রবন্ধগত হইতে পারিত।

পরিশেষে শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রেম সুদ্ধমাত্র নারীচরিত্রে কোন্ কোন্ আদর্শে অভিব্যক্ত হইয়াছে এই প্রবন্ধে শুধু তাহারই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এ প্রবন্ধ ব্যক্তিগত, প্রেম সম্বন্ধে ইহাই চরম সিদ্ধান্ত নয়। কোন সমস্যাই আজ পর্য্যন্ত চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। কারণ সত্য সহানুভূতি সাপেক্ষ।

সুতরাং শরৎচন্দ্র প্রেমের যে দুটি আদর্শ ধরিয়া দিয়াছেন তাহা যদি কেহ গ্রহণ করিতে না পারে তাহাকে দোষ দিব না। প্রেমের অনেক আদর্শই থাকিতে পারে কিন্তু তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

[আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে শিবপুর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা সভায় ১লা ফাল্গুন তারিখে পঠিত।—লেখক।]

ভুল

যখন ছেলেদের মেয়েদের দেশী ছবি আঁকায় পাগল সুরু করিনি তখন একা থাকি এই চেয়ারটাতে বসে আজ সবাই বলছে দেশী ছবি সবাই লিখছে দেশী ছবির সমালোচনা, আমি সেই আমার পুরাতন চেয়ারে বসে ছবি আঁকছিনে কিন্তু ফাটা কোলাচ্ছি আর ভাবছি কোথায় বা আমার দেশ কোথায় বা দেশী আর্ট। ভুল ভুল ভুল। ভুল করে আমি ছবি আঁকা সুরু করি আবার ভুল করেই সেটা বন্ধ করি। এখনো কিন্তু এরা বড় সজাগ ভোলবার ছেলে নয় তারা সকাল সন্ধ্যা ছবিকে আদর করে নেয়, তবে সত্যিই তাদের কাছে ছবি আঁকা— কি ভুল, কি ভুল কি ভুল।

চৈত্র, ১৩৩৩

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুল

যখন ছেলেদের মেয়েদের দেশী ছবি আঁকার পালা সুরু হয়নি তখন একা আঁকছি এই চেয়ারটাতে বসে, আজ সবাই আঁকছে দেশী ছবি, সবাই লিখছে দেশী ছবির সমালোচনা; আমি সেই আমার পুরাতন চেয়ারে বসে ছবি আঁকছিনে কিন্তু ফটো তোলাচ্ছি আর ভাবছি কোথায় বা আমার দেশ কোথায় বা দেশী আর্ট! ভুল ভুল ভুল। ভুল করে আমি ছবি আঁকা সুরু করি আবার ভুল করেই সেটা বন্ধ করি। এখনো কিন্তু ছাত্র তারা বড় সজাগ, ভোলবার ছেলে নয় তারা, সত্যি সত্যি তারা ছবিকে ঠাউরে নেয়, ভাবে সত্যিই তাদের কাজ ছবি আঁকা—কি ভুল, কি ভুল, কি ভুল!

চৈত্র, ১৩৩৩

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী হুদিয়ের "স্বামী"

Mercel Prevost হইতে অনুবাদ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে করো না আমি এই অশ্রু-পূর্ণ মর্ত্ত্যভূমিকে আর বেশী দিন আমার ভারে ভারাক্রান্ত রাখব। আমি বৃদ্ধা কুমারী, আমার জীবনের কেবল একটিমাত্র টানের জিনিষ ছিল; আমার বার্দ্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও আমি এক রকম সুখেই ছিলাম। কিন্তু এখন এই টানটুকু চলে গেছে, এখন এর অস্তিত্বমাত্র নাই; কখনও ছিল বলে মনে হয় না। সেটা একটা মনের ভুল, এখন আছে শুধু আমার কুকুর "মুস্টাশ্", আমার হারমোনিয়াম—আর অনন্ত যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন।...আমি যদি প্রেমানলে দগ্ধ অল্প বয়স্কা বালিকা হতেম তা হলে সুন্দর বাঁধানো একটা কপি বই-এ আমার গুপ্ত দুঃখের কথা লিখে একটু আরাম পেতাম...কিন্তু একচল্লিশ বৎসর বয়সে কখনও নূতন অভ্যাস আরম্ভ করা যায় না। চৌদ্দ বৎসর থেকে তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি ভালবেসেছি, ভালবাসা পেয়ে এসেছি—এমন কি কাল আড়াইটা পর্য্যন্ত। প্যারিসের ও লণ্ডনের কোনও পেশাদার সুন্দরীও এতটা অহঙ্কার করতে পারে? আমাদের একদিনও ঝগড়া হয় নি। বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হয় নি। সে উনত্রিশ বৎসর ব্যাপী পূর্ণ ভালবাসা।

(২)

ব্যাপারটা এই রকম করে আরম্ভ হয়েছিল—

আমার বাপ আবগারী বিভাগের একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সব লোক কোনও বড় পদ পায় না; কেন না যখনই কোনও কাজ খালি হয় অমনি একজন কম ভীতু লোক কিম্বা যার মুরুব্বির জোর আছে এমন কোনও লোক এসে ঢুকে পড়ে। তিনি সমস্ত জীবন "সার্থ্" মহকুমায় উদ্ভিদের মত অচলভাবেই কাটিয়েছিলেন; তাঁর বিবাহের পর সেইখানেই একটা কাজ পেয়েছিলেন, আমি সেই খানেই জন্মেছিলুম—মানুষ হয়েছিলুম।

সেই খানে জিব্রি বলে' একটা জায়গায়" আমার স্বামীর" সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার মা বাপ

'আমার মা বাপ্ আমিও সেই ক্ষুদ্র বালক, লুসিয়াঁকে ঐ নামে ডাকতুম। ওর মা বাপ্ আমাদের প্রতিবেশী। লুসিয়াঁর স্কুলের ছুটি হলেই প্রতিবৎসর দুইমাস ওর মা বাপের কাছে এসে থাকৃত। তার বাপ্ পমিটের তদারক নবিশ—সচ্চরিত্রের লোক, বৃহৎ পরিবার। তাহা স্বল্পবেতনে স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তানকে ভরণ পোষণ করা বড় একটা সহজ ছিল না।

লেভেরডের তুলনায় স্বল্প আয় ও একটি সন্তান সত্ত্বেও আমার বাপ মাকে ধনী ব'ললেও চলে। অতএব আমি লুসিয়াঁর সঙ্গে "বিবাহ" করতে রাজী হয়েছিলুম—তা কোনও স্বার্থের মতলবে নয়। তা ছাড়া আমাদের দুজনেরই বয়স চৌদ্দ বছর ছিল—সে আমার চেয়ে ছ'মাসের বড়। ঐ বয়সে অর্থের কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।

লুসিয়াঁ ও আমি আমরা বেশ দুটি প্রেমিক যুগল... লুসিয়াঁ বড় ভীতু ও শান্ত ছিল; তার সঙ্গে আমি যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করতুম। আমি তার বিশ্বাস জন্মে দিয়েছিলুম যে, সে আমার স্বামী এবং সে তা' মেনে নিয়েছিল।

চৌদ্দ ও আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে স্বামী হওয়ার মানে—ছুটির সময়, ছোট ভায়ের মত আমার পিছনে পিছনে ছোটা। আমরা কখনও কখনও পরস্পরকে চুমো খেতুম। আমাদের চড় চাপড়ের সময় যে রকম মনের ভাব হোত, চুমোতেও আমাদের প্রায় সেই রকম মনের ভাবই হোত.. এই তেতাল্লিশ বৎসর পরে আমার এখন মনে হচ্ছে—আমি আবেগহীন ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলুম। আর লুসিয়াঁ ছিল একটি ক্ষুদ্র বালিকার মত—আমার চেয়েও সংসার অনভিজ্ঞ।

আঠার বৎসর বয়সে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হোল। লুসিয়াঁর বাপ লেভের্ডিন্, মুরুব্বীর জোরে একটা বড় কাজ পেয়ে গেলেন। তিনি পূর্ব্বে একজন ধনী ইংরেজের সঙ্গে ভ্রমণ-সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন; তখন সেই ইংরেজ কার্য্য উপলক্ষ্যে সমস্ত জীবন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াত,—এখন সেই ইংরেজ আমোদের জন্য ভ্রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। এবারও লেভের্ডিন্ সেই ইংরেজের সঙ্গী হলেন। তিনি একজন ফরাসী সঙ্গী চাচ্ছিলেন, কেন না কথা বার্ত্তায় ফরাসীরা লোকদের খুব আমোদ দিতে পারে, তাদের কথাবার্ত্তা বড়ই মনোরম। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় লুসিয়াঁ বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছিল—কিন্তু এখন পৃথিবী দেখে বেড়াবে মনে করে তার যেন আনন্দ হোল...। আমাদের ভবিষ্যতের মতলব আমরা ভুলি নি। 'যখনই সাবানের বুড়ো সওদাগর (সেই ইংরেজ—রবিন্সনের সাবান) আমাকে যথেষ্ট টাকা দেবে, তখনই তাকে ছেড়ে আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'...যথেষ্ট টাকা করতে কতদিন লাগবে? ঠিক বলতে পারি নে—বোধ হয় বেশী দিন নয়—মাস কতকের মধ্যে আমাদের বিয়ে নিশ্চয় হয়ে যাবে। আমিও লুসিয়াঁর উৎসাহের ভাগী হলুম; যখন আমরা পরস্পরের মাঝ থেকে বিদায় নিলুম, তখন অশ্রুজলের সঙ্গে আমাদের হাসিও মিশে ছিল।

(৩)

এ সমস্ত ঘটেছিল পঁচিশ বৎসর আগে। প—চি—শ বৎসর! কালটা যথেষ্ট দীর্ঘ—এই সময়ের মধ্যে যে-সে স্ত্রীলোক একটা পরিবার পত্তন করতে পারে এবং অনেক সময় তার নিজের ছেলেপিলের পর আরেকটা বংশও দেখতে পারে। আমি জানি, এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না; আমাকে পাগল ঠাওরাবে। কিন্তু যাই মনে করুক কথাটা সত্যি। পঁচিশ বৎসর একটা জিনিষ আমার জীবনকে সুখী করেছে—সেটা কি?—না কাউকে আমি ভালবেসেছি, আর কেউ আমাকে ভালবেসেছে। বিধাতার দয়া আমার উপর খুব বেশী ছিল না। আমি বাপকে হারালুম, তারপর মাকে হারালুম। যে অল্প কিছু অর্থ ছিল, এক উকীলের জুচ্চোরিতে একদিন তা কমে' অর্দ্ধেক হয়ে গেল; তা সত্ত্বেও আমি আশা ছাড়ি নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভবিষ্যৎ আমার জন্য সুখ সঞ্চিত করে রেখেছে···এত বৎসর লুসিয়াঁর সঙ্গে না দেখা হলেও?

হাঁ, না দেখা হলেও। এর মধ্যে একবারও দেখা

হয় নি। আমাকে সে যা লিখত আমি তা দ্বিধাশূন্য হয়ে বিশ্বাস করতুম; কারণ এই পাঁচ বৎসর বরাবর তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি—তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভণ্ডুল হবার কোন আশাই দেখি নি; মনে হোত তার ভালবাসার ছাপ ওতে দৃঢ় মুদ্রিত রয়েছে। এই কয়েক বৎসর পৃথিবী দেখে বেড়াচ্ছে। আমার লুসিয়ঁটি ইজিপ্‌ট, উত্তর আফ্রিকা, রুশিয়া, ইণ্ডিয়া, আমেরিকা—'রবিন্সন সাবানের' সঙ্গে এই সব দেশে ভ্রমণ করেছে... কখন কখন সে ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এত শিগ্‌গীর এত তাড়াতাড়ি যে, জিব্‌রিতে গিয়ে যে, তার "স্ত্রীকে" দেখে আসবে সে সময়টুকু সে পায় নি। হাঁ তার স্ত্রী—তার চিঠিপত্রে সে আমাকে "স্ত্রী" বলেই সম্বোধন করত, আর আমি উত্তরে লিখতুম, "আমার প্রাণের স্বামীটি।"

(৪)

কাল প্রায় দুটার সময় যখন আমি আগামী রবিবারে বাজাবার জন্য হার্মোনিয়মে সঙ্গীত অভ্যাস করছিলুম আমার দাসীটি আমাকে এসে বল্লে যে, একজন মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি আমার মা বাপের একজন পুরাতন বন্ধু, পণ্ডিত মহলে তাঁহার একটু নাম আছে—তিনি বোধ হয় "প্রাথমিক পাঠশালা-সমূহের সাধারণ পরিদর্শক"। যাঁরা তাঁর বালিকা অবস্থায় তাঁকে জানতেন তাঁদের কাছে তাঁর কৃতিত্ব জাহির করবার জন্য জিব্‌রীতে ফিরে এসেছিলেন। আধঘণ্টা ধরে আমাদের কথাবার্ত্তা হল। একে একে সব পুরোনো আলাপীদের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলুম। অবশেষে তিনি আমাকে বল্লেন :—

"আর মোসিয়ো লেতের্ভ—তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়?"

"লুসিয়ঁ লেতের্ভ?"

"হাঁ, যিনি ইংলণ্ডে ডার্বিশিয়ারে বিবাহ করেছেন?"

আমি কোন রকম করে উত্তর দিলুম—"না। আমি আর তাঁকে দেখতে পাই নে।"

আমি আরও খুঁটিনাটি করে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি তখনই সমস্ত কথা আমাকে বল্লেন।

সম্প্রতি বোর্ড-স্কুলের বন্দোবস্ত দেখবার জন্য তাঁকে কারখানা প্রদেশে পাঠান হয়েছিল। কয়েকদিন সেখানে তিনি কাটিয়েছিলেন, এবং ডার্বিতে 'রবিনসন সাবানের' কারখানায় কার সঙ্গে দেখা হল, মনে কর? আমার স্বামী, রবিনসনের উত্তরাধিকারী তিন ছেলের বাপ সেই লুসিয়ঁ লেতের্ভের সঙ্গে।

(৫)

যখন আমি একলা হলুম, আমি একটু কাঁদলুম; তারপর আমার নিজেরই হাসি পেল, আমি কি নির্ব্বোধ,—একজন পুরুষ মানুষ পঁচিশ বৎসর ধরে শুধু কি একটা স্মৃতিকে বুকে ধরে থাকতে পারে? এ কথা সত্যি, আমি এই স্মৃতির উপরে আমার সমস্ত যৌবন, আমার সমস্ত রূপ লাবণ্য ঢেলে দিয়েছিলুম সেই যৌবন ও রূপ লাবণ্যের মূল্যে আমি হয় ত একজন আসল স্বামী পেতে পারতুম। ...আমি এই ধরণে লুসিয়ঁকে পত্র লিখতে লাগলুম; বিশেষতঃ সে আমাকে চিঠিপত্রে যে রকম প্রবঞ্চনা করেছে সেই কথা বলে আমি তাকে অনেক তিরস্কার করলুম। তারপর আমার মনে হল, ভাগ্যি এই রকম প্রবঞ্চিত হয়েছিলুম, তাই ত এই পঁচিশ বৎসর আমার সুখে কেটে গেছে। লুসিয়ঁ আমার মনে এই বিভ্রমটা জন্মে না দিলে, এই বৎসরগুলো আমার কি করে কাটত কে জানে। হয় ত একথা সে নিজেই বুঝেছিল, তাই নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন তার বিবাহ হয়েছিল, সে ইচ্ছে করেই আমাকে বলে নি যে, "বেচারী 'আদেল' তুমি আমার কথা আর ভেবো না..."

তাহলে এখন সাহস ধর্, এখন আর কাঁদিস্ নে। আমি বিবাহিত বলে চব্বিশ বৎসরকাল বিশ্বাস করে এসেছি; আজ আমি বিধবা বা পতি-পরিত্যক্তা, শুধু এই মাত্র। তারপর যখন মনে করি তার তিনটি ছেলে

...আমি যদি তাকে বেশ অনুরাগ পূর্ণ একখানি পত্র লিখি আর বলি, তোমার একটি ছেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। অবশ্য আমি তাকে ইংলণ্ডের বর্ত্তমানষী ধরণে মানুষ করতে পারব না, ফরাসী ধরণে মানুষ করব—তার বাপ যে ফরাসী ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইতেন সেই ফরাসী ভাষায় তার সঙ্গে কথা কইব; মুসিয়াঁ নিশ্চয়ই আমার এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করবেন। যদি আমি এই ছেলেটিকে মানুষ করি, তাহলে আমার বাড়ী থেকে আমার কবরের যে রাস্তা সেই রাস্তা আমি ধৈর্য্যের সহিত অনুসরণ করতে পারব।

এই কথা মনে করে আমার মন বেশ প্রফুল্ল হয়েছে।

আর, নির্ব্বোধ বুড়ী আদেল্ হুদিয়ে, চশমা পর্, একটা ভাল কলম নিয়ে 'রবিনসন সাবানের' উত্তরাধিকারীকে পত্র লেখ্। এখন চাই একটু সাহস ও শুভ ইচ্ছা—নিষ্ঠুর নিয়তিকে পরাভব করবার জন্য এই শুধু দরকার। যেমন তুই "স্ত্রী" হয়েছিলি, তেমনি তুই আবার "মা" হবি—**কল্পনাস্ত্র**।

নববর্ষের গান

শ্রীগোপাললাল দে

পুরাতন গেছে নববর্ষের যাত্রা হয়েছে সুরু,
পিছনে এখনও প্রতিধ্বনিছে শঙ্খের গুরু গুরু;
এ হেন সময়ে কুণ্ঠিত দেহ মাথাটিরে রাখি পায়,
পথের প্রান্তে কে তুমি বন্ধু খর্জ্জুর-বীথি-ছায় ?
বামবাহু তব জড়ায়ে ধরেছে দক্ষিণ কফোনীরে,
দক্ষিণ বাহু ধূলি প'রে বৃথা রেখা অঙ্কিয়া ফিরে,
নয়ন দুটির আনত দৃষ্টি মানসাম্বুধি নীরে,
ডুবিয়া ডুবিয়া কি খুঁজে বন্ধু, নামহারা মণিটিরে ?

সম্মুখে চলেছে বিজয় যাত্রা উঠিয়াছে কোলাহল,
কোটি কণ্ঠের ধ্বনিত হর্ষে কণিত আকাশতল,
নববর্ষের সফল উষায় এসেছে আলোর বাণ্,
সকল প্রাণের বেদনা মুছাতে এল যাত্রার গান।
ঘরে যারা ছিল বাহিরিল পথে মাতিল নান্দী গানে,
পিছনে যা ছিল ধূলিসম ত্যজি চলিল সমুখ পানে।
কোথা যাব ? কেন ? এ কথা প্রশ্ন করিতে সময় নাই,
এমন দিনেও অলসের মত তুই পড়ে রবি ভাই।

বার বার তোরে ডেকে গেল তারা সঙ্গে যাবার তরে,
তুই ব্যথাহত মুখ অবনত কি গো সে লজ্জা-ভরে,
বেদনা তোরে কি দেছে কেউ সখা, করেছে কি হতমান,
তরুণ বুকের করুণারে কেহ করেছে কি অপমান?
স্নেহ দিয়ে তুই পেলি কি রে বিষ, মৃত্যু কি দিয়ে ক্ষেম,
শ্মশান-দগ্ধ অঙ্গার কি রে পেলি দিয়ে মণি হেম,
তাই একা তুই নীলাকাশ-তলে খুলে বক্ষের দ্বার,
হৃদয় দেবের চরণে সাজাস্ বেদনার জবাভার?

কিন্তু বন্ধু, হে তরুণ প্রিয়, এই কথা মনে রাখো,
ওই যে তোমার সমুখে চলেছে যাত্রীর দল লাখো,
ওই যে কাহারো শিরে উষ্ণীষ, অনাবৃত কারো শির,
অনাবৃত কারো দেহ পদ কারো, দ্রুত-গতি কেহ ধীর
কেহ চেয়ে আছে দিগন্ত পারে কেহ গায় জয়গান,
তুই নাহি গেলে স্বপ্নের মত বৃথা ওই অভিযান,
প্রভাতের গান আকাশের আলো বৃথা উহাদের কাছে,
লক্ষলোকের বক্ষে যা নাই তোর বুকে তাই আছে।

মরুভূর মাঝে গান গেয়ে তুই বাগান সাজাবি কবে?
হত্যাকারীর হাতিয়ারে তোরে বেহালা বাজাতে হবে;
জ্বলে যাওয়া মাটি সবুজ করিয়া কুসুম ফোটাবি জুঁই,
পাহাড়েরে ভাল বাসিয়া রে কবি, ঝরণা ছোটাবি তুই;
শ্মশানের হাওয়া মঙ্গলময় মলয় করিয়া আনা,
মৃত্যুরে দিতে অমৃত মন্ত্র শুধু তোরি আছে জানা।
মানসকুসুম তোর মুখ চেয়ে আরও কত কাল রবে,
কেবলি মুকুল ঝরাইলি যদি ফুল ফুটাইবি কবে?

আয় তবে কবি আয় উঠে আয় ঝেড়ে ফেল্ অবসাদ,
প্রাণভরে শুধু নেরে শিরে তোর দেবের আশীর্ব্বাদ।
যে দিয়েছে দুখ এক মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে তার কথা,
কোথা কেবা তোরে করেছে আঘাত ভুলে গিয়ে সেই ব্যথা,
ওই অভিযান সফল করিবি কর্ শুধু এই পণ,
ভাল দিয়ে চির মন্দই পাবি এ যে তোর প্রাক্তণ,
তাই বলে কি রে নববর্ষের নব প্রভাতের বায়,
বসে থাকা চলে পথের প্রান্তে খর্জ্জুর-বীথি-ছায়?

যাদুঘর

উপন্যাস

শ্রীনরেন্দ্র দেব
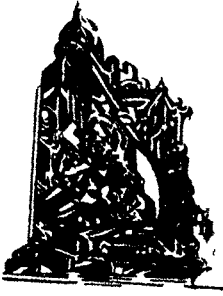
"—একটু ডান দিকে মুখটি ফেরাও ত! ব্যস্—আর না—থাক্।—এঃ বড্ড বেঁকিয়ে ফেললে যে! হ্যাঁ, এইবার ঠিক হ'য়েছে, বাঃ।—আচ্ছা এইবার একটু এ পাশে হেলে দাঁড়াতে হবে—হ্যাঁ, এই বেশ হ'য়েছে। আর নোড় না কিন্তু;—ওকি, হাতটা চেয়ারের মাথার উপর থেকে নামিয়ে নিলে কেন? হ্যাঁ, ওই রকম ধরে থাকো—এ হাতটা যে আবার ঢাকা প'ড়ে গেছে! সাড়ীর আঁচলটা একটু গুটিয়ে কাঁধের উপর তুলে নাও দেখি,—আহা, ও রকম জড় করে নয়, দাঁড়াও, তুমি ছেড়ে দাও, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি—

ক্যামেরা-ঢাকা কালো কাপড়খানা মাথার উপর হ'তে সরিয়ে ফেলে একটি বাইশ তেইশ বছরের সুশ্রী ছেলে তার সুন্দর মুখখানিকে যেন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের মতো বার করে নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

ক্যামেরার সামনে ছিল একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে। ফটো তোলবার জন্য তার মধ্যে যেন কোন আগ্রহই নেই। বোধ হচ্ছিল—অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শহরের একটি গলির মধ্যে একখানি ছোট একতলা বাড়ীর ছাদের এক কোণে চিল-কোঠার পাশে আলসের ধারে এই ব্যাপার চলছিল।

বিভার বিশৃঙ্খল আঁচলখানি সযত্নে গুটিয়ে তার কাঁধের উপর সাজিয়ে দিয়ে প্রকাশ তার ডান হাতটি চেয়ারের মাথার মাঝখান থেকে সরিয়ে এক পাশে তুলে দিলে। তারপর, তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল মুগ্ধ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

লজ্জায় বিভার মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। সে মুখটি নীচু করে বললে—আর তোমায় ফটো তুলতে হবে না, ছাড়; বেলা চারটে বাজ্‌ল এখনি গিয়ে উনুনে আগুন দিতে হবে, এ বেলার রান্নাবান্না সমস্ত বাকী; মিভা ইস্কুল থেকে এলো বলে, তাকে এখনি জলখাবার দিতে যেতে হবে। দু'ঘণ্টা ধরে আর তোমার ফটো তোলা হচ্ছে না।

প্রকাশ আস্তে আস্তে ক্যামেরার কাছে ফিরে এল। কালো কাপড়খানা চট্ ক'রে আবার মুড়ি দিয়ে বললে—নাও, এইবার ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও। চটে গেলে ত' চলবে না, ফটো যে তোলাতেই হবে বিভা, মাষ্টার মশা'য়ের হুকুম! বর পক্ষ থেকে তোমার ছবি চেয়ে পাঠিয়েছে যে!—ওকি হঠাৎ আবার অত মুখভার হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? ফটো ভাল হবে না যে! না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। এমন ছবি তুলবো যে, যে দেখবে সে-ই এ মেয়ে পছন্দ না ক'রে পারবে না—একটু হাস না বিভা, লক্ষীটি তোমার হাসিমুখ সব চেয়ে সুন্দর—

—আবার তুমি ওই সব কথা ব'লছো, আমি এখনি নীচেয় চলে যাবো কিন্তু—

—না না, আর বলবো না, লক্ষীটি; আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। আচ্ছা, একটু মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করো না বিভা—দোহাই তোমার—

—কয়েদী কি ফাঁসির হুকুম শুনে হাসতে পারে প্রকাশ-দা?—

এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভার অধর প্রান্তে একটু ম্লান হাসি দেখা দিয়েছিল এবং প্রকাশও নিপুণ শিল্পীর মতো তৎক্ষণাৎ ক্যামেরাটি ব্যবহার করতে ভোলেনি। কিন্তু বিভার এই জিজ্ঞাসা তার মনকে এমন একটা প্রবল ধাক্কা দিলে যে, ছবি তোলা শেষ হ'য়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর বিভাকে বলতে পারলে না যে—তার কাজ ফুরিয়েছে, বিভা এবার যেতে পারে।

এমন সময় নীচে থেকে নিভার গলা পাওয়া গেল, সে ইস্কুল থেকে এসে তার দিদিকে খুঁজছে।

—ওই বুঝি নিভা এল, আমি চললুম ভাই, ছবি তোলা আর একদিন হবে এখন—

ব'লতে ব'লতে বিভা বিদ্যুৎ বেগে নীচেয় নেমে গেল। প্রকাশ তখন আস্তে আস্তে ক্যামেরাটি গুটিয়ে রেখে ছাদের আলসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌ল—বিভাও তবে তার বিবাহের সংবাদটাকে কয়েদীর ফাঁসির হুকুমের মতোই ভয়াবহ বলে মনে করছে!

অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথাই প্রকাশের মনে পড়তে লাগল।

সে তখন প্রথম তার মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, তখন সে এই বিভারই বয়সী, বিভা তখন সবে সাত বছরের মেয়ে, তখন বিভার মা বেঁচেছিলেন। কী স্নেহের চক্ষেই তিনি তাকে দেখেছিলেন, কত আদর যত্নই করতেন। কথায় কথায় প্রায়ই তিনি বলতেন-- প্রকাশ আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, আমি প্রকাশের সঙ্গে আমার বিভার বিয়ে দিয়ে ওকে আমার জামাই ক'রে নেবো! তারপর নিভা এল। নিভার জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুণ্যবতী স্বর্গে চলে গেছেন। তিনি বেঁচে থাকতে প্রকাশকে নিত্য ইস্কুলের ফেরত তাঁর কাছে আসতে হ'তো। প্রকাশ এলেই তিনি বিভাকে ডেকে বলতেন—"বিভা তোর বর এসেছে, দে ওর জল খাবারটা এনে দে"—তখনকার সেই সাত বছরের মেয়ে বিভা সে কথা শুনে লজ্জায় পালিয়ে যেতো, বলতো আমি পারবোনা তুমি এনে দাও না।

বিভার মা'র মৃত্যুর পর থেকে প্রকাশ আর রোজ আসে না বটে কিন্তু প্রায়ই আসে! সে ছিল তখন ইস্কুলের ছেলে, আজ সে এম-এ পড়ছে—আর সেই সাত বছরের বিভা—আজ রূপসী পঞ্চদশী!

মৃত পত্নীর ঐকান্তিক ইচ্ছাটি মাষ্টার মশাই ভুলতে পারেন নি, তাই বিভার অন্যত্র বিবাহ দেওয়া স্থির হবার পূর্ব্বে তিনি প্রকাশের পিতার কাছে তাঁর স্বর্গীয় পত্নীর ইচ্ছা জানিয়ে তার কন্যার সঙ্গে প্রকাশের বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে প্রকাশের পিতা সম্মত হননি। তিনি মাষ্টার মশাইকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, তাঁর মতো একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলের বিবাহ এক সামান্য স্কুল মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে দেওয়া অসম্ভব; তিনি অন্য কোন পাত্র স্থির করুন, প্রকাশের পিতা তাঁকে তাঁর কন্যাদায়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করবেন। তাই মাষ্টার মশাই নিরুপায় হ'য়ে বিভার বিবাহের সম্বন্ধ আজ অন্যত্র স্থির করতে বাধ্য হয়েছেন।...কিন্তু বিভার মা আজ বেঁচে থাকলে কি হ'তো কে জানে।

একহাতে চা'য়ের পেয়ালা এবং আর এক হাতে গরম হালুয়া এক প্লেট নিয়ে বিভা যখন ছাদে উঠে এল গোধূলির ম্লান আলো তখন সন্ধ্যার আগমনীর সুর ভাঁজছিল।

—এই নাও,—একটু চা খাও প্রকাশ-দা, একলাটি চুপটি করে ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছ এতক্ষণ? কেন, নীচেয় নেমে এলে তো রান্নাঘরে ব'সে একটু গল্প করতে পারতুম!—

প্রকাশ কোনও উত্তর দিলে না। শুধু বিভার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার সে দৃষ্টি উদাস ও অর্থহীন।

বিভা প্রকাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে ছাদের আলসের উপরই পেয়ালা ও ডিশখানি সাজিয়ে দিয়ে বললে—কি ভাবছ ?

প্রকাশের যেন চমক ভাঙল। বললে—ভাবছি যে, বিভা, মানুষের বংশমর্য্যাদা আর আভিজাত্য গর্ব্ব কি এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই সেকালের মতই অসংখ্য দুর্ভাগা নর-নারীর বুকের উপর দিয়ে তাদের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার রথচক্র অবাধে চালিয়ে যাবে ? কেউ তাদের বাধা দেবে না ?

চায়ের পেয়ালাটি আলসের উপর থেকে নিয়ে প্রকাশের হাতে তুলে দিয়ে বিভা মৃদু হেসে ব'ললে—তুমি কি বিদ্রোহী হ'বে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাতে লাভ ?

—লাভ, দুটি জীবন চির দুঃখের দুঃসহ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবে।—

—এই মাত্র ?

—আর, একটা দৃষ্টান্তও থেকে যাবে এই প্রাণহীন সমাজের হাহাকারের মধ্যে যে,—জগতে সবার আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লেও, যে পরিণয় পরস্পরের ভালবাসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিধাতার আশীর্ব্বাদ তার উপর বর্ষিত হয় শ্রাবণের ধারার মতো।—

—বাঃ সে বেশ হবে! তাহ'লে তুমি লেগে যাও প্রকাশ-দা—এই বলে প্রকাশের নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটি তার হাত থেকে নামিয়ে নিয়ে, হালুয়ার ডিশখানি তুলে দিয়ে বিভা খুব খানিকটা হেসে উঠ্‌ল। তারপর যথাসাধ্য গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বললে—তবে, একটা কথা তোমাকে এই বেলা বলে রাখা ভাল যে, তোমার এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করবার জন্য আমাকে যেন ডাক দিও না ভাই, আমার দ্বারা কিছু হবে না; আমি একেবারেই অপদার্থ।—

প্রকাশ কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বিভা তাকে সে সুযোগ না দিয়েই—দাঁড়াও, একগ্লাশ জল নিয়ে আসি—ব'লে চট্ ক'রে নীচেয় চ'লে গেল।

জলের গেলাশটি হাতে ক'রে সে যখন ফিরে এল, দেখলে হালুয়া যেমনকার তেমনিই ডিশে পড়ে রয়েছে, প্রকাশ একটুও খায়নি।

বিভা খানিক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—হালুয়াটা খেলে না যে! ভাল হয়নি বুঝি ?

প্রকাশ কোনও উত্তর দিলে না। বিভা তখন স্পষ্ট ক'রেই বললে—তুমি যা বলছ তা হয় না প্রকাশ-দা। তুমি তো জানই কত অল্প বয়সে আমরা মাকে হারিয়েছি। আমাদের মুখ চেয়েই বাবা আর সংসার করেন নি। কত খানি ত্যাগ করেছেন তিনি বল তো এই মেয়েদের জন্যে। তুমি কি আমাকে এত স্বার্থপর মনে করো যে, নিজের সুখের জন্যে আমি তাঁকে অসুখী করবো ?...

প্রকাশ একথা শুনে ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কিন্তু, তিনি তো এ বিবাহের কোনও দিনই বিরোধী ছিলেন না বিভা ?

—না, তা ছিলেন না বটে; কিন্তু আজ যদি মা ফিরে এসেও তাঁকে অনুরোধ করেন তাহ'লে তাঁকেও বিফল মনোরথ হ'তে হবে। তোমাদের ওখান থেকে যদি তাঁকে শুধু অসম্মতিটুকু পেয়েই ফিরে আসতে হ'তো, তাহ'লে হয়ত তিনি এতটা ক্ষুণ্ণ হ'তেন না, কারণ সে আশঙ্কা তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে যে অসম্মান তাঁকে নিতে হ'য়েছে সেটার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আমার কাছে বলতে বলতে তিনি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না, বললেন—বিভা, আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভিক্ষুক ত' নই মা! তাঁর ছেলেকে পড়িয়ে আমি যে টাকা পাই সে আমার পারিশ্রমিক, সে তো তাঁর দান নয়। তবে কেন তিনি মনে করলেন যে, আমি কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়ে তাঁর দ্বারস্থ হ'য়েছি কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের জন্যে! ছিছিঃ কি লজ্জার কথা বলো তো ?

প্রকাশ একটু ভারি গলায় বললে—বুঝিছি বিভা, সে অপমানের শাস্তি আমাকেই নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! ..আচ্ছা, আমি আজ তবে যাই,—

প্রকাশ চলে যাচ্ছিল, বিভা তার একটি হাত ধরে ফেলে বললে—সে হবে না, আমি যে শতকর্ম্ম ফেলে সাজ-গোজ-

তাস্তি তোমার জন্য মোহনভোগ তৈরি করে নিয়ে এলুম, সে বুঝি ফেলে রেখে যাবার জন্য? শীগ্গীর লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নাও বলছি!

প্রকাশ তবুও ইতস্তত ক'রছে দেখে বিভা বললে—আজ বাদে কাল তো বিদায় হ'য়ে যাচ্ছি, আর তো আমার অত্যাচার তোমাকে সহ্য করতে হবে না প্রকাশ-দা; যে কটা দিন আছি, একটু সেবা করে নিয়ে যেতে চাই, তাও কি দেবে না?

বিভার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল, প্রকাশ যেই ডিশখানি তুলে নেবার জন্য হেঁট হ'য়েছে, সে অমনি সেই অবকাশে আঁচলে তার চোখ দুটি মুছে নিলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে উঠে তিল তিল ক'রে রজনীর কালোরূপটি গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পূর্ণিমার পরিপূর্ণহাস্যের আলোকচ্ছটায় তা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

(২)

রবিবার দুপুর থেকেই কেশবদের বাড়ীতে মস্ত তাশের আড্ডা বসেছিল। তিন চার সেট ব্রীজ্ খেলা শেষ হবার পর হেমদাস বললে—কই কেশব, সিগারেট ফুরিয়ে গেল যে! দাও আর এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দাও। বলে সে তাকিয়েটা বাগিয়ে মাথায় দিয়ে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

প্রিয়ধন একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত কড়িকাঠের দিকে উঁচু ক'রে দিয়ে একটা সজোরে হাই তুলে ব'ললে—নাঃ চা নইলে তো আর পারা যাচ্ছে না। দেখি একবার আমাদের কমল বৌদিকে তাড়া দিয়ে আসি।

কেশব ব'ললে—বোস্ বোস্, চা'য়ের জল চড়িয়েছে ষ্টোভে, আমি দেখে এসেছি, এই একটু আগে—

অক্ষয় ব'ললে—কেশব-দা' শুধু চা'য়ে কিছু হবে না ভাই, সারাদিন ব্রীজ খেলে, যা কিছু খেয়ে এসেছিলুম সব হজম হ'য়ে গেছে, কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করো।

হেমদাস এতে আপত্তি করে ব'ললে—তুই কি রকম কবি অক্ষয়? কেবলই স্থূল আহার্য্যের প্রতি লোভ তো কবির পক্ষে শোভা পায় না, তোরা ভাবুক মানুষ, কোথায় ভাবের রাজ্যে বসে চাঁদের আলো পান করবি, ফুলের গন্ধে বিভোর হবি, মলয় হাওয়ায় ভেসে বেড়াবি, তা না হ'য়ে একেবারে কিনা বাস্তব!

অক্ষয় বললে—হ্যাঁ তুমি ঠিক আর্টিষ্টের যোগ্য কথাই বলেছো বটে, কিন্তু কি জানো বন্ধু, খালি পেটে চাঁদের আলোও কালো ঠেকে, ফুলের গন্ধ কোনও আনন্দই দিতে পারে না; এ অবস্থায়—

"মলয় হাওয়ায় ভাস্তে যাওয়া
শুধুই কেবল কষ্ট পাওয়া!

কনক অক্ষয়কে সমর্থন করে বললে—তা যা বলিছিস্ অক্ষয়, আমি তো বেশ হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝতে পারছি এখন।

অক্ষয় উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—ঐ শোন হেম, তোমাদের বাংলা দেশের উদীয়মান ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-লাঞ্ছনকারী শ্রীকনক চট্টোপাধ্যায় কি বলছে শোনো—

"কবির বচন মিথ্যা বলে না
কবির নয়ন মিথ্যা হেরে না—"

তোমার রংয়ের বাক্স আর তুলি নিয়ে তুমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দরতম করে ফুটিয়ে তুলতে পারো বটে, কিন্তু তার অন্তর্নিগূঢ় বেদনাকে ব্যক্ত করতে পারো কি?

বিজয় বললে, সে পারে কেবল এই আমার মতো দীন-দুঃখী কেরাণী যারা! আমরা এক একজন হচ্ছি একেবারে বিশ্বের বেদনার মূর্ত্তিমান অভিব্যক্তি!

কথাটা শুনে সবাই খুব হেসে উঠলো দেখে দ্বিজেন বললে—এঃ তোরা দেখছি সব বেজায় বেয়াদপ। এ কথায় তোদের মুখে হাসি এলো? এত বড় মর্ম্মভেদী সত্য শুনে হেসে ওঠার মতো বে-আইনী কাজ আর কিছুই হতে পারে না ব'লে আমার বিশ্বাস।

কেশব ধমকে উঠে বললে—থাম্ বাপু, তুই দুদিন উকিল হয়ে আর কথায় কথায় আইন দেখাসনি, এখনও তোর গা' থেকে কলেজের গন্ধ যায় নি—

দ্বিজেন বললে—তুই সোনা রূপার কারবারী, আইনের

কি বুঝবি?—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কি জানে? এই আইনের মধ্যেই সাহিত্য, শিল্প, কাব্য সঙ্গীত—সব আছে—

ক্ষিতীশ বললে—এ যে তুমি সেই কাত্যায়নের পাণিনি সূত্রের মতো সুরু করলে দেখছি, আমায় ড় একখানা ভাল দেখে 'আইন সঙ্গীত' শিখিয়ে দিওতো দাদা, উকীলদের মজলিশে গাইতে হবে।

আবার ঘরের ভিতর একটা হাসির হর্‌রা উঠল।

এমন সময় কেশবের স্ত্রী কমলা একখানি ট্রে-তে অনেকগুলি গরম চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

সবাই এক সঙ্গে কলরব করে কমলাকে অভ্যর্থনা করে নিলে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভিক্ষুকদের মতো সবারই হাত এক সঙ্গে প্রসারিত হল এক এক পেয়ালা চায়ের জন্য। কমলা ক্ষিপ্র হস্তে নিপুণা গৃহিণীর মতো তাদের সকলেরই হাতে এক এক পাত্র গরম চা পরিবেশন করে দিলেন। হাতে পাবা মাত্র কেউ বলতে লাগল—বৌদির জয় হোক্, কেউ বা বলতে লাগল যাদের বৌদি নেই তাদের কেউ নেই। কেউ বা বল্লে, কমলা দেবীকে অন্নপূর্ণারূপে যদি কোনও ভক্ত দেখতে চায়, তাহলে তার কাশী না গিয়ে কেশবের মন্দিরে আসা উচিত।

একপাত্র চা উদ্বৃত্ত হ'ল দেখে কমলা বললে—কই, আপনাদের প্রকাশ বাবু আজ অনুপস্থিত কেন?

কেশব বললে—সে হতভাগার কথা আর বোলনা—সেই তো জানো তার সেই মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে সে কি রকম ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু তার বাপ সেখানে বিয়ে করায় কিছুতেই মত দেন নি, সেই অবধি বাপের সঙ্গে তার একটু মনান্তরও হয়েছিল, সম্প্রতি সে মেয়েটির শুনছি অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, প্রকাশ সেই থেকে একেবারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন শাক্যসিংহের মতো গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

অক্ষয় বললে—উপমাটা ঠিক হল না কিন্তু কেশব! শাক্যসিংহ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন তাঁর প্রেমময়ী প্রিয়তমা বনিতা—সুন্দরী গোপার গাঢ় আলিঙ্গনের ভিতর থেকে; আর প্রকাশের যাওয়াটা হ'চ্ছে তার সেই বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের অভাব-জনিত মনঃক্ষোভে। শাক্যসিংহের গৃহত্যাগটাকে সুতরাং অনেকটা সৌখীন বলা যেতে পারে, অর্থাৎ কিনা রাজৈশ্বর্য্য ভোগ বিলাসে,—প্রমোদ ও প্রমদায় অরুচি হওয়াতেই তিনি সখ করে চলে গেলেন সন্ন্যাস নিয়ে একটু মুখ বদলাতে—যেমন মাছ মাংসে অরুচি হ'লে লোকে নিরামিষ ধরে জানো তো? সেই রকম আর কি? কিন্তু আমাদের প্রকাশ এই যে গেল বিবাগী হয়ে,—এইটেই হচ্ছে আসল 'ট্রাজেডি!'

কনক চট্টোপাধ্যায় এর ঘোরতর প্রতিবাদ করে বললে—তুমি যা বলছ অক্ষয়, তাতে তোমার বন্ধু-বৎসলতা হয় তো খানিকটা জানা যাচ্ছে, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ছে ত্যাগের মূল্য সম্বন্ধে তোমার ঘোর অজ্ঞতা। যে ভোগের প্রাচুর্য্য থেকে হঠাৎ একদিন ত্যাগের নিঃস্বতাকে বরণ করে নিতে পারে সেই ত যথার্থ মহাপুরুষ, নইলে ভোগের আস্বাদ যে লোক কখনও পায়নি, তার আবার ত্যাগটা কোথায়? সে ত্যাগের মূল্যই বা কি?—

অক্ষয় এ কথার কোন জবাব দেবার আগেই হেমদাস বলে উঠল—যিনি প্রাচ্যজগতের জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন সেই বিশ্ব-বিশ্রুত মহাপুরুষের সম্বন্ধে অক্ষয়ের এ 'ব্লাসফেমী' যদিও আমি সমর্থন করতে পারি নি, তবুও একথা তোমাকে মানতেই হবে কনক, যে, ভোগের উপাদান যার পক্ষে সহজ লভ্য ছিল সে যদি ত্যাগের কৃচ্ছ্রতাকেই বরণ করে নিয়ে থাকে—ভোগ সুখের প্রলোভনকে হেলায় জয় করে, তাহলে শাক্যসিংহের চেয়ে তার মনের জোরও নিতান্ত কম নয়!

তর্কটা বেশ জমে আসছিল ঠিক সেই সময় কমলা একখানি কাচের বড় প্লেটে করে কড়াই শুঁটির কচুরি এবং আলু বর্কটীর শিঙাড়া ভেজে এনে হাজির করলে।

সে যে চা পরিবেশন করে কখন আবার এগুলি আনতে গেছল, তর্কের মুখে কেউ আর সেটা লক্ষ্য করে নি।

প্লেটখানি নামিয়ে রাখতে না রাখতেই কচুরি শিঙাড়ার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এবং সেই গোলমালের মধ্যে সে দিনকার মতো শাক্যসিংহ যে কোথায় হারিয়ে গেলেন আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না!

শুধু কেশবের গলা শোনা গেল, সে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলছে—চট করে নে, আর দেরী করে গেলে বায়-স্কোপের টিকিট কেনা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

—ক্রমশ

নব-পন্থা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সহসা আজিকে মিলেছে বন্ধু, বহুকাল পথ চলি,
পৌঁছিতে যশ-সৌধ-দেউড়ি অতিশয় সিধে গলি।
সংস্কারহীন যদিও মলিন সঙ্কীর্ণ এ পথ,
দৃশ্যে গন্ধে আন্ পান্থের খোয়া যায় ইজ্জৎ ;—
তবুও বন্ধু নবাবিষ্কৃত এ গলি এমনই সিধা,
মোর মত যশোলিপ্সুর তাহে পশিবারে নাই দ্বিধা।

পথটা হচ্ছে এই,—
গলা ছেড়ে শুধু তোমারে বন্ধু বেপরোয়া গালি দেই'
অল্পদিনের পরীক্ষা হ'তে লভেছি এমনই ফল,
এই পন্থায় জন্মেছে মোর আস্থা অচঞ্চল।
বন্ধু গো তব হেন সুশাসন, যখনই তোমায় দুষি,
জিভ কেটে কানে হাত দেয় বটে, মনে মনে সব খুসি।
তাই বুঝিয়াছি সহজ উপায়, যশ তার করতলে,
বিশ্বের মুখে মৌন যে দুখ বুক ঠুকে যেবা বলে,
স্থির করিয়াছি মনে,—
সৃষ্টি বিচারে স্রষ্টামহিমা প্রচারিব ত্রিভুবনে।

যোগাড় করিয়া খোল করতাল সঙ্গী দু'একজন,
পথে পথে গেয়ে বেড়াব তোমার 'বদ্‌নাম কীর্ত্তন।'
প্রথম প্রথম ভীরু ও ভক্ত হবে বটে কিছু রুষ্ট,
হয়ত অনেক বেগ পেতে হ'বে এ দল করিতে পুষ্ট।
কিন্তু এ কথা জানি,—
হেন সমাদরই লভে যুগে যুগে মহাপুরুষের বাণী।
কালে সব দিক হ'য়ে যাবে ঠিক, বুঝেছি প্রাণের প্রাণে,
আবাল বৃদ্ধ হইবে মত্ত বদ্‌নামামৃত পানে।
মধুর এ বদ্‌নাম,—
দাবদগ্ধের স্নিগ্ধ প্রলেপ, অবিরামজ্বরে ঘাম।
নাম মাহাত্ম্য দু' আনা সত্য,—তাই সকলের জানা;
কিন্তু বন্ধু, বদ্‌নাম তব সত্য চৌদ্দ আনা।
নামকীর্ত্তনে স্বেদ পুলক ত বাহিরের ত্বকে জাগে!
বদ্‌নামসংকীর্ত্তনে ভাই—হাড়ে যে বাতাস লাগে!

বন্ধু, এ কার পাপ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ?
গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,—
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা?
দোষী নহ যদি, কহ গো বন্ধু দেখাও না কেন মুখ?
নির্দ্দোষী চির লুকায়ে বেড়ায়,—এত বড় কৌতুক!
ভক্তেরা কহে আস যুগে যুগে প্রচারিতে নিজ নাম,—
হায় গো বন্ধু, কিবা হ'তে পারে এর বাড়া বদ্‌নাম!
এমন স্রষ্টা, এমনই সৃষ্টি, হেন তার কৌশল,
এ যুগে ও যুগে, এ বেলা ও বেলা বিগ্‌ড়িয়া যায় কল!
নিজে এসে এসে ছদ্মবেশেতে ঠুকে-ঠেকে দাও জোড়;
দু'দিন না যেতে ঢিলা হ'য়ে যায়,—হেন বিদ্যার দৌড়!
বার বার নিজ অক্ষমতায় আপনি লজ্জা মানি,
কল্পে কল্পে ভেঙে গুঁড়ো কর সাধের সৃষ্টি খানি!

বন্ধু গো তুমি আর যাই হও, শিশু কি পাগল নহ;
মনের মতন গড়িতে পারিলে কেবা তারে ভাঙে কহ?
যা কিছু গ'ড়েছ, যা কিছু ক'রেছ,— দশদিকে দু'শ দোষ;
তাই তব প্রাণে জাগে বিফলের অসীম অসন্তোষ।

এক ভুল হ'তে নিষ্কৃতি পেতে ক'রে কেন আর ভুল ;
ভ্রম হ'তে ভ্রমে এ মৃগতৃষাই জগৎ-গতির মূল।
এ নহে সৃজন-আনন্দ-লীলা, বিবর্ত্তনের ধারা,—
পাথরের বুকে যে ভুল ভুলিলে বুকের পাথরে সারা।
হৃদয়ে হৃদয়ে থাক যদি সখা জানত হৃদয়-ব্যথা,
হৃদয় লইয়া শিক্ষানবিশী,—কতটা নিষ্ঠুরতা!
এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ-ব্রহ্মেরই লাগে নি কি ভাই ধোঁকা ?
আপন ভুলের জটিল গুটিতে অদৃশ্য গুটিপোকা!
বাঁচাইতে গেলে পোকার জীবন থাকে না গুটির দাম,
গুটি যদি গোটা পেতে চাই, তবে লুপ্ত পোকার নাম।

বন্ধু, বন্ধু গো!
ভাল চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশী নাহি ত সন্দেহ।
আরও ভাল গড়া সম্ভব কিনা নহে আজ সে বিচার,
না যদি পারিবে, গড়িতে বন্ধু কিবা ছিল অধিকার?
যাহা কিছু পাইলাম,—
তাই নিয়ে যদি মূঢ়ের মতন নেচে নেচে গাহি নাম,
তবে তোমা হ'তে, সত্য হইতে, দূরে স'রে যাব ভাই,—
'মিথ্যানামে'র বদলে সত্য 'বদ্‌নাম' তাই গাই।
তিক্ত সত্যে চ'টে যান যদি ভক্তের ভগবান,
মোরে ছেড়ে তিনি আন্ সাধুদের করুন পরিত্রাণ।
আমি র'য়ে গেনু বিনাশের আশে দুষ্কৃতদের দলে ;
দেখিব বন্ধু মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে।

মীনকেতন

উপন্যাস

ন্যুট্ হাম্‌সুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

টমাস্ গ্লাহন্ নামে এক শিকারী,—তার একমাত্র সহচর কুকুর ঈশপ—ঘন বনানীর মধ্যে তার কুটীরে একা দিন যাপন করত চারপাশের বিস্তীর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় উদার বন্ধুতায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল নর্ডল্যাণ্ড; নর্ডল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে যে অসাধারণ রহস্য রয়েছে গ্লাহ্নের আবেগাকুল জীবনে তা মিশে গেছে,—গ্লাহ্ন প্রকৃতির দুলাল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রকৃতির প্রতি স্পন্দনে কম্পনে উন্মুখ ব্যগ্রতায় ছন্দিত হয়ে ওঠে,—সমস্ত সৌন্দর্য্যমদধারা সে তার প্রাণপাত্র পরিপূর্ণ ক'রেই পান করে। তার কামনা যেমন বস্তুর নিগূঢ় সমগ্রতার জন্য,—তেমনি আবার সে ছোট একটি পাতার মর্ম্মরে, নির্জ্জীব প্রস্তরের বন্ধুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব ও অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ইঙ্গিত পাঠ করতে শিখেছে। বিস্তীর্ণ আকাশ ও ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুর এক সঙ্গে কোলাকুলি করছে। তার ভালোবাসার মধ্যে যে প্রবল আত্ম-উৎসর্গের ভাব আছে,—তাতেই মহিমান্বিত হয়ে রয়েছে তার সমস্ত না পাওয়া, তার মৃত্যু। হামসুনএর মধ্যে যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা রয়েছে, যে উচ্ছ্বসিত কল্পনা ও কবিতার প্রাচুর্য্য রয়েছে ও সমস্ত বস্তু জগতের উর্দ্ধে ধ্যানলোকের পানে যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—তা Panএর প্রতি পাতায় জাজ্বল্যমান হয়ে আছে দেখতে পাই।—অনুবাদক।

এই ক'দিন ধরে' আমি শুধু নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবছি, তার অক্লান্ত দিনগুলির কথা। এইখানে বসে' বসে' ভাবি—আমার সেই কুটীর, আর তার পেছনে সেই বনবীথি। আর সময় কাটাবার জন্য আবোল্ তাবোল্ লিখছি, নিজেকে খুসী রাখবার জন্য,—আর কিছু নয়; সময় ভারি আস্তে যাচ্ছে; যেমনটি চাই তেমনি তাড়াতাড়ি কাটছেনা, যদিও দুঃখ করবার আমার কিছুই নেই এতে;—আর আমি বেশ ভালোই ত' আছি। সব কিছুতেই আমি খুসী, আর আমার ত্রিশ বছর বয়েস ত' কিছুই নয়।

ক'দিন আগে কে আমাকে দুটি পালক পাঠিয়েছিল। একটি চিঠির কাগজে শিল্-মোহর-করা একটি ধুক্‌ধুকির সঙ্গে দুটি পাখীর-পালক। অনেক দূর থেকে পাঠিয়েছে। এগুলোকে ফিরিয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। এও আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল,—ঐ দুটি ছোট্ট সবুজ পালক-গুচ্ছি। তা ছাড়া আমার কোনই যন্ত্রনা নেই। শুধু অনেকদিন আগেকার একটা গুলির ঘায়ের দরুণ বাঁ পায়ে মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা টের পাই একটু। এই যা।

দু'বছর আগে, আমার বেশ মনে আছে, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটেছিল—অন্ততঃ এ দিনগুলির তুলনায়। আমাকে না জানিয়েই গ্রীষ্ম বিদায় নিয়েছিল। দু'বছর আগে—১৮৫৫ সনে—আমার জীবনে যা ঘটেছিল, বা যা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, নিজেকে একটু আমোদ দেবার জন্য এইখানে তা লিখে রাখি। এখন আমি তখনকার অনেক কথা ভুলে গেছি। কিন্তু বেশ মনে করতে পারছি সে বছরের রাত্রিগুলি ছিল ভারি হাল্কা। আর অনেক জিনিষই অপরূপ ও আশ্চর্য্য লাগ্‌ত

আমার কাছে। বছরে বারোটি মাস,—কিন্তু রাত্রি ছিল দিনেরই মতো, আকাশে একটি তারাও দেখা যেত না। আর যে সব লোকের দেখা পেতুম,—অদ্ভুত; যাদের চিন্‌তুম এরা যেন তাদের থেকে ঢের আলাদা; এরা যেন এক রাতেই শৈশব থেকে গৌরবান্বিত প্রৌঢ়তায় বিকশিত হয়েছে। কোন মাহুই এতে নেই; কেবল আমিই এমনটি আর দেখিনি। না, দেখিনি।

সমুদ্রের ধারে সাদা প্রকাণ্ড বাড়ীটায় একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে খানিকক্ষণের জন্য আমার মন তোলপাড় করে' দিয়েছিল। আমি এখন সব সময় আর তার কথা মনে করি না,—না, ভাবিনা আর; তাকে ভুলে গেছি। কিন্তু আর আর সব কথা ভাবি, সমুদ্রের পাখীদের কান্না, বনে বনে আমার শিকার, আমার রাত্রি, আর সেই নিদাঘের তপ্ত মধুর মুহূর্ত্তগুলি। শুধু একদিন আচম্‌কা তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে একটি দিনের জন্যও তার কথা মনে পড়্‌ত না।

যে কুটীরে থাকতাম, তার থেকে এলোমেলো দেখা যেত পাহাড়, জাহাজের পাল, দ্বীপের টুক্‌রোগুলি, সাগরের খানিকটা জল আর নীলাভ পাহাড়ের চূড়ার একটুখানি। আর আমার কুঁড়ের পেছনে ছিল বন,—অগাধ, প্রকাণ্ড। আমার সারা মন খুসীতে ভরে উঠ্‌ত শিকড় আর পাতার গন্ধ পেয়ে; ফার্‌-গাছের ভারী গন্ধ আমার নাকে এসে লাগ্‌ত—চর্ব্বির গন্ধের মতো মিষ্টি! শুধু এই অরণ্য আমার সমস্ত মন জুড়িয়ে দিত মা'র মতো; আমার মন শান্ত হত, চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ত। দিনের পর দিন ঈশপকে পাশে নিয়ে এই বুনো পাহাড় মাড়িয়ে যেতাম। এ ছাড়া আর কিছুই চাইতাম না,—থাক্‌না বরফে আর নরম কাদায় সমস্ত মাটি ঢেকে। ঈশপ ছাড়া আমার আর কোন সাথী ছিল না। এখন কোরা আমার সহচর; তখন ছিল কিন্তু ঈশপ,—আমার কুকুর, আমি তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছি।

সারাদিন গুলি ছুঁড়ে সন্ধ্যায় কুঁড়েয় যখন ফিরতাম, অনুভব করতাম আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অনুকম্পায় আর্দ্র একখানি স্নেহস্পর্শ কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে, মধুর স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র একটি শিহরণ। সে কথা ঈশপকেও বলতাম, আমরা কী আরামেই না আছি। "এখন একটা গুলি ছুঁড়ব, আর একটা পাখী ভেজে ফেল্‌ব উনুনে।" তাকে বলতাম। "তুমি কি বল ?" তারপর রান্না শেষ হলে আমরা খেতাম, উনুনের পেছনে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে ঈশপ গুড়ি মেরে শুয়ে পড়ত, আমি পাইপটা জেলে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে শুয়ে গাছের মৃদু মর্ম্মর শুন্‌তাম। একটি ঝিরিঝিরি হাওয়া কুঁড়ের দিকে বয়ে আস্‌ত, শুন-তাম ঐ পাহাড়ের পেছনে একটা বুনো মোরগ ডাক্‌ছে। তা ছাড়া আর সব নিঝুম।

শুয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। সারা গায়ে পোষাক, খেয়াল নেই, সমুদ্র-পাখীদের কলরব শুরু না হওয়া পর্য্যন্ত ঘুম আর ভাঙে না। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি বড় বড় কারখানার বাড়ী, সিরিল্যাণ্ড-এর বন্দর ঘাট, ঐ খান থেকেই ত রুটি নিয়ে আসি রোজ। আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাক্‌তে ভালো লাগে, আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, এইখানে এই নর্ডল্যাণ্ড-এ কি করে এলাম!

তারপর ঈশপ উনুনের ধার থেকে তার লম্বা কৃশ দেহটি মুড়ি দিয়ে বগ্‌লস্‌টিতে একটু আওয়াজ ক'রে, হাই তুলে লেজ নেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ত, আর আমিও লাফিয়ে উঠ্‌তাম—তিন চার ঘণ্টা বিশ্রামের পর বটে। নিবিড় আনন্দে তা ভরা, নিবিড় আনন্দে ভরা ত' সবই।

এমনি করে' আমার অনেক রাত কেটে গেছে।

দুই

ঝড় আর বৃষ্টি—এমন কিছু নয় যাতে বিশেষ কিছু আসে যায়। বাদলা দিনের সঙ্গে প্রায়ই অল্প একটুখানি আনন্দ ভেসে আসে, মানুষকে তার আনন্দ নিয়ে একলা কোথাও উধাও হয়ে চলে যাবার জন্য উতলা ক'রে তোলে। কোথাও গিয়ে একটু দাঁড়াও, মাথার ওপরে সোজা তাকিয়ে থাক খানিকক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু একটু হাস আর চারদিকে চোখ ফেরাও। কি ভাববার আছে আর? জানলাতে কদর্য একখানি

পর্দা, পর্দার ওপর রৌদ্রের একটু ঝিকিমিকি. একটি ছোট্ট ঝর্ণায় করতালি বা হয়ত মেঘের মাঝ খানে নীল আকাশের ছোট্ট একখানি ফালি। এর বেশী কিছু চাইনে আর। দরকার হয় না।

আর আর সময় অপ্রত্যাশিত জম্‌কালো আনন্দও মানুষকে তার নির্জ্জীবতা ও বিষণ্ণতা থেকে বাঁচাতে পারে না। নাচঘরে বসে কেউ আরাম পেতে পারে বটে, কিন্তু উদাসীন,—কিছুই দোলা দিতে পারে না যে। দুঃখ আর আনন্দ নিংড়ে বের করতে হয় আপনার অন্তর থেকে।

এবার আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। সমুদ্রের পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একেবারে না ব'লে ক'য়ে বৃষ্টি নেমে এল, খানিকক্ষণ মাথা গোঁজবার জন্য একটা খোলা নৌকাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গুন্‌গুনিয়ে একটু সুর ভাজ্‌ছিলাম, মন খুসী ছিল ব'লে নয়, অম্‌নি,—সময় কাটাবার জন্য। ঈশপ আমার সঙ্গেই ছিল, ব'সে ব'সে শুনছিল। আমিও আমার গুন্ গুন্ বন্ধ করে শুনতে পেলাম বাইরে গলার আওয়াজ—সাম্‌নে কারা জানি আস্‌ছে। হঠাতের একটু কারসাজি, মামুলী মোটেই নয়। একটি ছোট দল—দুটি পুরুষ আর একটি মেয়ে। যেখানে বসেছিলাম, হুড়-মুড়িয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে আর হাসছে।

—"শিগ্‌গির। যতক্ষণ না ধরে, এখানেই ব'সে পড়।"

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটি লোকের সাদা গরম সার্টটার সমুখটা একেবারে ভিজে ফুলে উঠেছে, সেই ভিজা জামাটার সামনে একটা হীরার বোতাম। পায়ে লম্বা ধারালো-মুখ জুতো,—তাকে একটু কেমনতর যেন দেখাচ্ছিল। তাকে শুভ দিনের অভিনন্দন জানালাম—সে ম্যাক্, ব্যবসাদার; আমি রুটির দোকান থেকে ওকে কতদিন দেখেছি। ও আমাকে কতদিন ওর বাড়ীতে যেতে বলেছে, যখন খুসী,—আমি যাইনি।

—"আরে, তুমি যে!" আমাকে দেখে ম্যাক্ হেঁকে উঠ্‌ল। "আমরা কারখানায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিরে আসতে হল। এমন বিশ্রী দিন করেছে যে—কি হে লেফ্‌টেনেণ্ট কবে সিরিলাণ্ড-এ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?"

তার সঙ্গী ছোট কালো দাড়ীওয়ালা মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল;—ডাক্তার, ঐ গির্জ্জার কাছেই থাকে।

মেয়েটি তার ঘোম্‌টা নাক পর্য্যন্ত অল্প একটুখানি তুললে, ফিস্‌ফিসিয়ে ঈশপের সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু করেছে। তার জ্যাকেটটি দেখলাম, জামার লাইনিং আর বোতামের গর্ত্তগুলি দেখে বোঝা যায় রং করা এই জ্যাকেটটি। ম্যাক্ তার সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিল; তার মেয়ে, এডভার্ডা।

ঘোম্‌টার আড়াল থেকে এডভার্ডা আমাকে একটি ভাঙা চাউনি উপহার দিল, আবার কুকুরটার সঙ্গে আলাপ সুরু করেছে, ওর কলারের লেখা পড়ছে।

—"ও! তোমাকে ঈশপ বলে ডাকে! ডাক্তার, ঈশপ কে ছিল? আমি ত' জানি,—অনেক গল্প লিখেছিল। ফ্রিজিয়ান ছিল, না? কিছুই মনে নেই।"

খুকী, পাঠশালার মেয়ে। তার দিকে চাইলাম—দীর্ঘ, বয়স পনেরো ষোলো হবে, পেলব দুখানি হাত, দস্তানা নেই। হয়ত সেই সন্ধ্যায় ঈশপের অর্থটা ভালো করে' জান্‌তে অভিধান খুঁজেছিল। কে জানে!

ম্যাক্ জিগগেস করলে কি খেলায় মেতে আছি আজকাল? কি কি বেশি শিকার করি? আমার যখনই দরকার তখনই ওর নৌকো পেতে পারি—ওকে একটু জানাতে হবে মাত্র। ডাক্তার কিছুই বল্লে না। যখন ওরা চলে' গেল, দেখলাম ডাক্তারের হাতে একটা লাঠি, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্‌ছে।

আগের মতনই ফাঁকা মন নিয়ে পায়চারি করি, উদাসীন ভাবে গুন্‌গুনাই। নৌকোঘরের এই পরিচয় আমার মনে কোনো পরিবর্ত্তন আনে নি, শুধু মনে পড়ছে

ম্যাকের সেই ভিজা শার্টটা, হীরার সেই চাক্‌তিটা—হীরাটাও ভিজা, তেমন চাকচিক্যও আর তাতে নেই।

তিন

আমার কুঁড়ের পেছনে একখানি পাথর আছে—একটি দীর্ঘ ধূসর পাথর। বন্ধুর মতন আমার চোখের পানে তাকায়,—আমি যখন যাই তখন ও যেন আমাকে দেখেছে, এখনো ফিরে আস্‌বার সময় ফের দেখছে। ভোর বেলা বেরুবার সময় এই পাথরের পাশ দিয়েই হেঁটে গেছি, একটি বন্ধু যেন পেছনে ফেলে এলাম; জানি আবার যখন ফিরে যাব আমার সেই বন্ধুটিই তেম্‌নি সেখানে প্রতীক্ষা করে' বসে' থাক্‌বে।

তারপর বনে বনে মৃগয়ায় মাতোয়ারা,—হয়ত শিকার মিলল, হয়ত বা কিছুই না।

ঐ দ্বীপগুলির পেছনে সমুদ্র গভীর শান্তিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' আছে। কতবার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে ঐ সমুদ্রকে আমি দেখেছি। শান্ত নিশুতি দিনে জাহাজগুলি যে চলে মনে হয় না, তিনদিন ধরে' বকের পালকের মতো সাদা একই পাল যেন আমি দেখতে পাই। তারপর হয়ত যদি বা বাতাস একবার মেতে ওঠে, দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি মেঘে মেঘে কালো হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঈশান কোণ্ থেকে ঝড় ক্ষেপলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর দেখি। আমার চমৎকার খেলা। সমস্ত কিছুই একটি বিস্তীর্ণ কুয়াসায় গা ঢেকেছে। মাটি আর আকাশের মিলন; রূপকথার রাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেহারা নিয়ে সাগরের ঢেউ লাফালাফি সুরু করে—বাতাসে সর্বনাশের নিশান ওড়ায়। ঝুলে-পড়া পাহাড়ের কোটরে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবি—আমার সমস্ত হৃদয় ভরা। ভাবি, এ কি দেখছি আমি এখানে, এই সমুদ্র আমার সম্মুখে তার অতল রহস্য ভাণ্ডার উন্মোচন করেই বা দেখাবে কেন? হয়ত আমি মাটির মস্তিষ্কের যন্ত্রণাটাই দেখ্‌ছি—উপরশিরে ফুটছে আর ফেনায় ফেনায় পিষে উঠছে। কে জানে? ঈশপ্ আরি চঞ্চল হয়ে ওঠে; বেচারা তার পা দুটো কষ্টে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাক সিটকে খালি হাঁচে। তারপর আমাকে কিছু জান্‌তে না দিয়েই কখন যে আমার পায়ের তলায় শুয়ে আমারই মতন সমুদ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকে, কিছুই জানিনে। আর একটিও রা নেই, কোথা থেকেও মানুষের একটি আওয়াজ শোনা যায় না, খালি দুরন্ত বাতাসের গোঙানি আমার মাথার চারিদিক দিয়ে ডুক্‌রে চলেছে। দূরে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়; সমুদ্র রাগে যখন ওদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনে হয় জলের দানব ভিজা বাতাসে উঠে এসে গর্জ্জন কর্‌ছে। ওর জটায় শ্মশ্রুতে সমস্ত দিক অন্ধকার কালো হয়ে গেল বলে'। আবার ও ঢেউয়ের মাঝে এসে ডুব দেয়।

সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কয়লার মতো কালো একটি জাহাজ পথ বেয়ে·····

বিকেল বেলা জাহাজঘাটে যখন পৌছুলাম, কয়লা-কালো জাহাজটা এসে পারে ভিড়েছে।—চিঠির জাহাজ। এই দুষ্প্রাপ্য অতিথিটিকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার জন্য ঘাটে লোক জমেছে বিস্তর। লক্ষ্য করলাম সবারই চোখ নীল,—থাক্‌গে অন্য সব পার্থক্য, নীল তাদের চোখ। একটি মেয়ে মাথায় সাদা পশমের রুমাল বেঁধে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কাল নিবিড় চুলের গুচ্ছ,—তার পাশে সাদা রুমালটিকে ভারি সুন্দর অদ্ভুত মানিয়েছিল কিন্তু। মেয়েটি আমার পানে আশ্চর্য্য হয়ে তাকাচ্ছে,—আমার এই পোষাক, এই বন্দুকটা। তার সঙ্গে সেই কথা কইলাম, একটু থতমত হয়ে মাথাটি সরিয়ে নিলে। বললাম,—'তুমি সব সময়েই এমনি শাদা রুমাল পরো, কেমন? তোমাকে সুন্দর মানায়।'

আইসল্যাণ্ড-এর ফতুয়া-পরা একটা মোটা লোক ওর কাছে এসে ওকে এস্তা বলে ডাকল। তবে তারই মেয়ে ও নিশ্চয়। আমি এই মোটা লোকটাকে চিনি, পাড়ার কামার। এই ক'দিন আগেই ত আমার বন্দুকটা মেরামত ক'রে দিয়েছে।

বাতাস বুঝি তাদের কাজ ক'রে ফিরে গেল, সমস্ত বরফ গলে গেছে। ক'দিন ধরেই একটি নিরানন্দ

গুমোট পৃথিবীর বুক চেপে বসে ছিল, পচা ডালপাতা-গুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, কাকেরা দল বেঁধে নালিশ করছিল। কিন্তু বেশীদিন নয়। সূর্য্য কাছেই ছিল,—একদিন বনের পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল। যখনি সূর্য্য উঠে আসে, আমি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটি মধুর আনন্দের শিহরণ অনুভব করি, নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় কাঁধের ওপর বন্দুকটা তুলে নি,···আমার বন্দুক!

চার

এ দিনগুলিতে আমার শিকারের কমতি হয় না, যা চাই তাই মারি; খরগোস বনমোরগ পাহাড়ে-পাখী। আর কোন দিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লে যদি সাগর-পাখী নজরে পড়ে তাকেও গুলি করতে ছাড়ি না। ভারি সুন্দর যাচ্ছে এ সময়; দিনগুলি ক্রমেই বড় হয়, বাতাস আরো স্বচ্ছ হযে আসে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন দুয়েকের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠি, ল্যাপদের দেখা পাই, ওরা আমাকে মাখন খেতে দেয়,—চমৎকার মাখন, ঠিক শাকের মত স্বাদ। সেই পথ দিয়ে কতবার হেটে গেছি। তারপর ফের্ বাড়ী ফিরে কোন পাখী মেরে ঝোলাটার মধ্যে পূরে রেখেছি। ঈশপকে সামনে নিয়ে আমি ব'সে পড়ি। আমার কত মাইল নীচে সমুদ্র পড়ে আছে, পাহাড়ের গা-গুলি ভিজা, জলের ছোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে এসেছে, একটি অনবিচ্ছিন্ন মধুর কলরব উঠছে। আমার এই চেয়ে থাকার সময়টি কত সংক্ষেপ করে দিয়েছে এই পাহাড়ের নীচেকার জলধারার অস্ফুট কলতান! এখানে, আমি ব'সে ব'সে ভাবি এই অশ্রান্ত মধুর গানটি নিজের খেয়ালেই বেজে চলেছে, কেউ ত শোনে না, কেউ ভাবেও না এর কথা, তবু নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে সব সময়! বেশ অনুভব করি, যখন আমি এই মৃদুল গানটি শুনি তখন এই পাহাড়গুলি আর নির্জ্জন নেই, ভ'রে উঠেছে। আবার আচম্‌কা কিছু ঘটে ওঠে। বজ্রের করতালি শুনে পৃথিবীর বুকে চমক লাগে, পাহাড়গুলি সমুদ্রের বুকের মধ্যে পিছ্‌লে পিছ্‌লে ডুব দেয়, ধোঁয়াটে ধূলোয় দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঈশপ বাতাসে নাক বাড়িয়ে হাঁচে।

এক ঘণ্টা কেটে যায় হয়ত—হয়ত তারো বেশী,—সময়ের বুঝি পাখা আছে! ঈশপকে ছেড়ে দিই, ঝোলাটা কাঁধে তুলে বাড়ীর দিকে পা ফেলি। দেরী হয়ে যায়। নীচে বনের কাছে এসে আমার পুরোণো অতি-পরিচিত পথটি এসে ধরি, ফিতের মতো সরু আকাবাঁকা পথ। ওর প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড় ঘুরে ঘুরে চলি সময় কাটাবার জন্য—কোন তাড়াতাড়ি ত' নেই। কেউই ত নেই অপেক্ষা ক'রে বাড়ীতে! শাসনকর্ত্তার মত স্বাধীন, ইচ্ছামত এই প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াই,—আমার যেমন খুসী। সমস্ত পাখীর কণ্ঠে গান থেমে গেছে, অনেকদূর থেকে শুধু একটা বুনো মোরগ ডেকে উঠছিল,—ও সব সময়েই খালি ডাকে।

বন থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে দুটি চেহারা দেখলাম, দুটি লোক হাটছে। দেখেই চিনলাম একজন জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডা—তাকে অভিনন্দন জানালাম—সঙ্গে তার, ডাক্তার। তাদের আমাকে বন্দুকটা দেখাতে হোল, আমার ঝোলা আর কম্পাস্‌টাও নেড়ে চেড়ে দেখল। আমার কুঁড়ে ঘরে তাদের নিমন্ত্রণ কর্‌লাম, তারা একদিন আস্‌বে বল্‌লে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে উনুন জ্বালালাম, একটা পাখী সিদ্ধ ক'রে খেলাম। কাল্‌কে আবার আর একটি দিন আসবে।...

সমস্ত দিক নিঝুম নীরব হয়ে আসে। জান্‌লা দিয়ে চেয়ে সেই সন্ধ্যায় চুপ ক'রে প'ড়ে থাকি। বন আর মাঠের ওপরে সে সন্ধ্যায় যেন পরীস্থানের আলো ঝিল্‌মিল্ করে, সূর্য্য ডগ্‌ডগে লাল আলোয় আকাশ রাঙিয়ে ডুবে গেছে। সমস্ত আকাশ ভারি স্বচ্ছ নির্ম্মেঘ; সমুদ্রের পানে তাকাই, মনে হয় যেন সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি; আমার প্রাণে দ্রুত স্পন্দন উঠ্‌ছে, ভারি আরাম অনুভব করছি কিন্তু। ঈশ্বর

জানে, আপন মনে ভাবি, ঈশ্বর জানে, কেন আজকের এই আকাশ সোনালি আর বেগুনি রঙে রঙিয়ে উঠেছে, ঈশ্বর জানে পৃথিবীতে কোনো উৎসব আজ জমে উঠ্‌ল কি না, তারায় তারায় কোনো আনন্দের মূর্চ্ছনা বাজ্‌ল কিনা, কোন নদীতে নৌকোর তন্নুলতা নাচ্‌ল কি না, ঈশ্বর জানে।···চোখ বুজি, নৌকো চালাই, আর চিন্তার পর চিন্তা মনের গাঙে ভেসে বেড়াতে থাকে।

আরো কতদিন চ'লে যায়।

বেড়াই, দেখি বরফ কেমন ক'রে জল হয়ে গ'লে পড়ে। কতদিন—ঘরে যখন খাবার থাকে,—একটা গুলিও ছুঁড়িনি। শুধু অগাধ মুক্তির উল্লাসে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর সময় চ'লে গেছে। যেদিকেই তাকাই, সব খানেই কিছু না কিছু দেখ্‌বার ও শোন্‌বার পাই, রোজই প্রত্যেক জিনিস একটু না একটু বদ্‌লে যাচ্ছে। ওসিয়ার আর জুনিপার-এর ঝোপ বসন্তের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে। একদিন কারখানায় গিয়েছিলাম; তখনো বরফে সব ঢাকা,—তবুও ওর চারপাশের জমি বছরের পর বছর মানুষের পায়ের ভারে ক্লেশ পাচ্ছে; বোঝা যায়, কত লোকের পর লোক তাদের কাঁধে শস্যের বোঝা নিয়ে এই পথ দিয়ে এসেছে ঐ কারখানায় গুঁড়ো করবার জন্য। ওখানে যাওয়া মানে মানুষের দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে হাঁটা; শুনেছি, ওখানকার দেয়ালে নাকি অনেক কথা আর তারিখ খোদা আছে।

বেশ, বেশ···

—ক্রমশ

সহজ

শ্রীনিরুপমা দেবী

(গান)

ত্যাগের ব্যথা বাজ্‌বে না আর প্রাণে যবে,
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।
অধিকারের নিগড় খু'লে
হাল্কা সুখের দোলায় দু'লে
অশান্ত প্রাণ লুটবে ধূলায়
আপন-ভোলা তোমার ভবে,
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।
চাওয়ার পালা সাঙ্গ ক'রে
রিক্ততারে বক্ষে ধ'রে
শঙ্করেরই ডঙ্কা তালে
শঙ্কটেরে বক্ষে লবে;
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।
দারুণতম পরম ক্ষতি
জাল্‌বে সেদিন চিতার জ্যোতি,
নির্ব্বাণেরই আশায় হৃদয়
চরণতলে চেয়ে র'বে;
সেদিন আমার তোমায় পাওয়া সহজ হবে।

এম্‌'এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবিতে আঙুল কেন লম্বা করতে হয়, চোখের কোণ কেন টেনে দিতে হয়, দেহের ঠাম কেন ভেঙ্গে গড়তে হয় ভাবের ছন্দ ধরে; কেন ঘাসে দিই আকাশের নীল, আকাশে দিই ধান ক্ষেতের সবুজ; কেনই বা বালিতে টানি জলের মরীচিকা, জলেতে দেখাই বালুচরের ভাব; কেন তারাকে পরাই ঝরা ফুলের সাজ, ঝরা ফুলকে সাজাই তারার টিপ্‌ দিয়ে; কেন পাখী জানাতে আঁখি লিখি, আঁখি জানাতে লিখি পদ্ম, লিখি সূর্য্য, লিখি কাজলটানা মেঘ; ফুল জানিয়ে লিখি কেন বা আরক্তিম কপোল, কেন বা বর্ষা জানাতে মেঘ-ডম্বুর সাড়ি ঘেরা রূপ—শিখীপুচ্ছ বাঁধা চূড়া; শরৎ জানাতে লিখি কাশকুসুমের গোছা ধরে নীল ফিতে; শীত গ্রীষ্ম এ সব জানাতে কেন বা লিখি—ঝরা পাতা, জ্বলাপাতা, সবুজ পাতা; কেন বা পূর্ণিমার চাঁদ লিখতে লিখে চলি প্রিয়া প্রিয়া; এ সব আর্টের রহস্য বোঝা এখন আমার কাছে সোজা হয়ে হয়ে গেছে; কিন্তু কেন যে ছেলেরা পুরুষ বাদ দিয়ে মেয়েই লেখে—হয় ভিজে সাড়ি পরা, নয় চুলের মুঠি ধরে, নয় বোম্বাই সাড়ি পোরে, নয় তো বা মাড়োয়ারি ঘাঘরা আর ওড়না ও কাঁচলী কসে; মেয়েগুলোকেই লেখে—কেউ মাসিক পত্র হাতে খাটিয়াতে শুয়ে বিরহিনী, কেউ রাণী বেশে গোয়ালিনী, কেউ বিহার সজ্জায় পূজারিণী, কেউ ফুটবলের মাঠে গোলার উপরে দাঁড়িয়ে উলঙ্গিনী; তার রহস্য এ পর্য্যন্ত আমার বোঝা হল না! আর্টের ভাষা কি মিহি গলার মেয়েলি টানের ভাষা, না সেটা পৌরুষ জানায় এমন একটা প্রচণ্ড ও প্রদীপ্ত ভাষা, এ প্রশ্নেরও জবাব পাই নি এখনো! আর একটা প্রশ্ন তারও জবাব খুঁজছি আমি—ছবি সে কি কবির কথার প্রতিধ্বনি, না নিজেই সে একটা ধ্বনি, একটা কবিতা! আরো একটা প্রশ্ন—কবি গাঁথলেন কথা দিয়ে মুক্তার যে হার তারি দুই লহর কি তিন কি সাত লহর ছবির বক্ষদেশে নয়, ছবির ফ্রেম খানার তলদেশে ঝুলিয়ে দিলেই কি ছবির তেলের রং-এ আর কবির চোখের জলের রং-এ এক হয়ে মিশতে পারে? আরো একটা মস্ত প্রশ্ন হচ্ছে এই—আর্ট, সে সন্তানের মতো দেশের ঘরে ঘরে জন্ম নেয়, না আর্ট ইন্‌সৃটিটিউটের পুকুর থেকে জীয়োনো মাছের মতো ছিপে, জালে ধরা হয়ে এসে পড়ে সেই ঘরটাতে যেখানে ভোজের চুলো আমাদের গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে হাঁড়ি ডেকচির তলায় সর্ব্বভুক্‌কে জাপ্‌টে ধরে!

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর

নজরুল ইস্‌লাম

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর,
খোলো দ্বার, ওঠ ওঠ বীর!
নিদাঘের রৌদ্র খর কণ্ঠে শোনো প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান!...

শ্রান্ত গত বরষের বিশীর্ণ শর্ব্বরী
স্খলিত মন্থর পদে দূরে যায় সরি
বিরাটের চক্রনেমিতলে।
চম্পামালা দোলাইয়া গলে
আলোক-তাঞ্জামে আসে অভিযান-রথী,
ঘুম-জাগা বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দ আরতি
ভেসে চলে খেয়া সম দিকে দিকে আজি।
বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ-কাঁসর ওঠে বাজি।

মর্‌মর-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণী-নটী
বিশুষ্ক পল্লব-নৃত্যে; ডগমগ পড়িছে উছটি
অসহ আনন্দ-মদে!
সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবা-রক্ত হ্রদে।
ওড়ে তার ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা
বৈশাখের বাম করে। ক্ষত-চিহ্ন আঁকা
নিখিল পীড়িত মুখে মুখচ্ছবি তার।
একি রূপ হেরি তব বেদনার মুকুরে আমার
অপরূপ! ওগো অভিনব!
কত অশ্রু জমাইয়া কতদিনে গড়েছ এ তরবারী তব?

সাঁতারিয়া কত অশ্রুজল,
হে-রক্ত দেবতা মোর, পেলে আজি স্থল ?
কোন্ সে বেদনা-পাণি বাণী অশ্রুমতী
করিতেছে তোমার আরতি ?

মন্দির-বেদীর শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলা কে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থলপদ্ম প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায় ?
জানি, তারি স-বেদন আবেদনখানি
খড়্গ হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি !
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে !
বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়-গোধূলি-লগ্নে মৃত্যু-মঞ্চে করে মাল্য দান।...

হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ !
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি
ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ !
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ।
আশার মশাল জ্বালি আলোকিয়া চলেছি আঁধার
অগ্রদূত নিশান-বরদার !

অতন্দ্রিত নিশীথ-প্রহরী—হাঁকিতেছি প্রহরে প্রহরে,
যৌবনের অভিযান-সেনাদল, ওরে,
ওঠ্ তোরা করি ত্বরা !
তিমিরাবরণ খোল, ছুঁড়ে ফেল্ স্বপন-পসরা !
ওঠ ওঠ বীর,
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর !

বিপ্লব-দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার।

বারেবারে এসেছে দেবতা
যুগান্তের এনেছে বারতা।
বারে বারে করাঘাত করি
দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রি দিন,
আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙিয়াছে বীণ্।

জাগিস্‌নি তোরা,
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিৎ মৃত্যু জরা।
এবার দুয়ার ভাঙি শিয়রে দেবতা যদি
আসিয়াছে পারাইয়া গিরি দরী সিন্ধু নদ নদী,
ওরে চির-সুন্দরের পূজারীর দল,
এবার এ লগ্ন যেন না হয় বিফল।

বারে বারে করিয়াছি যারে অপমান,
মন্দির-প্রদীপ যার বারেবারে করেছি নির্ব্বাণ,
বরণ করিতে হবে তারে।
পলে পলে বিলাইয়া মোরা আপনারে
যে আত্মদানের ডালা রেখেছি সাজায়ে
তাই দান দিব রক্ত-দেবতার পায়ে।

এবার পরাণ খুলে এ দর্প করিতে যেন পারি,
জিতি আর হারি,
ধরিয়াছি তোমার পতাকা—শুনিয়াছি তোমার আদেশ,
আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ।
দাঁড়ায়েছি আসি তব পাশ
শিরে ধরি অনির্ব্বাণ জ্যোতিষ্কের উলঙ্গ আকাশ।

বাহিরের রাজপথ বাহি,
হে সারথি, চলিয়াছি তব রথ চাহি ।
আলোক-কিরণ
করিয়াছি পান মোরা পুরিয়া নয়ন ।—

সুপ্তরাতে গুপ্তপথ বাহি,
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহী,
অকস্মাৎ
পিছে হ'তে করেছে আঘাত ।
মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানি রচেছে পর্ব্বৎ,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামীর নীতিবাণী লিখা,
দলে দলে করিয়াছে বিরংসার উলঙ্গ চীৎকার,
ফুঁ দিয়া নিবাতে গেছে হে ভাস্কর প্রদীপ তোমার

হে সুন্দর, মোরা শুধু তব অনুরাগে
আগে পিছে দেখি নাই চলিয়াছি আগে
লঙ্ঘি বাধা লঙ্ঘিয়া নিষেধ,
মানিনিক কোরাণ পুরাণ শাস্ত্র, মানিনিক বেদ !
নির্ব্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি,
যখনি ডেকেছ তুমি, হাঁকিয়াছি 'আছি মোরা আছি !'
ভরি তব শুভ্র শুচি ললাট-অঙ্গন
কলঙ্ক তিলক পঙ্ক করেছে লেপন,
বারেবারে মুছিয়াছি, প্রিয় ওগো প্রিয়
তোমার ললাট-পঙ্কে ম্লান হ'ল আমাদের রক্ত উত্তরীয় ।

যাদুকর মিথ্যুকের সপ্তসিন্ধুনীর
কতদিনে হব পার, পাব শুভ্র আনন্দের তীর ?

হে বিপ্লব-সেনাধিপ, হে রক্ত-দেবতা,
কহ কহ কথা।
শ্মশানের শিবা-মাঝে হে শিব সুন্দর
এস এস, দাও তব চরম নির্ভর।
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংস্রকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ।
অপগত হোক এ সংশয়,
দশদিকে দিগাঙ্গনা গেয়ে যাক যৌবনের জয়।

জরাগ্রস্ত অসুন্দর মিথ্যুকের হোক পরাজয়
এস এস আনন্দ সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ম্ময়।

১৩ই চৈত্র, '৩৩

দীপক

উপন্যাস

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১২৯৮ সাল।

শ্রাবণের এক বর্ষণ-ব্যাপ্ত সায়াহ্নে ভিতর বাড়ীতে শঙ্খ-ধ্বনি উঠিল!

কৃষ্ণনাথ বাহির বাড়ীতে টিনের চৌচালা বৈঠকখানায় বিক্ষিপ্ত মনে পায়চারী করিতেছিলেন। খাস্ চাকর পুরাতন ভৃত্য বংশীমোহন আসিয়া কর্ত্তাকে খবর দিল, একটি খোকা বাবু হয়েছে।

কর্ত্তা দুইহাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। মনের কোণে কোন্ দেবতাকে স্মরণ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি নিবেদন করিলেন। তারপর ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দিন-লিপিতে লিখিয়া রাখিলেন—৫টা ২৫ মিনিট, শুক্রবার, সন ১২৯৮ সাল, ১০ই শ্রাবণ, জননীর অষ্টম গর্ভের পুত্র সন্তান। খুব ঝড় জল ও বৃষ্টি। কি যেন কেন আশা হয়, এই পুত্র আজ আকাশের স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাহার কোনও কার্য্য বা জীবনের কোনও ঘটনা দ্বারা দেশের সাধারণ অবসাদ-ক্লিষ্ট জীবন ধারায় দীপ্তি নিক্ষেপ করিবে: সুন্দর ও শিব যিনি, তিনি এই পরিবার, দেশ, জাতি ও সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

(২)

কর্ত্তা ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন সিক্তবসন এক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁহার বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়া আছে। কর্ত্তাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী একটু হাসিল।

এই দুর্য্যোগে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কর্ত্তা একটু আশ্চর্য্যই হইলেন।

সন্ন্যাসী হাতজোড় করিয়া কর্ত্তাকে নমস্কার করিল। কর্ত্তা আরও বিস্ময়াভিভূত হইলেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি আপনার আত্মীয়, আশ্চর্য্য হবেন না। তবে সব সময়ে আমি আপনাদের খবর নিতে পারি না।

কর্ত্তা শহরের ছত্রিশ ঘরের খবর রাখেন, সতের'শ' ঘরের খবরদারী করেন, আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এমন কথা কখনও শোনেন নাই। এমন সন্ন্যাসীও দেখেন নাই। কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসীকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন।

সন্ন্যাসী তেমনি স্থির অবিচলিত ভাবে উত্তর করিল, তাহার এখন বেশীক্ষণ থাকিবার উপায় নাই। কেবল একটি কথা বলিতে সে এই ঝড় জলেও আসিয়াছে। আজ কর্ত্তার যে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল, যদি বাঁচিয়া থাকে তবে সে রাজা হইবে নচেৎ দীন ভিখারীর মত পরার্থে জীবন যাপন করিবে।

কর্ত্তা অনেক অনুরোধ করিলেও সন্ন্যাসী তাঁহাকে বুঝাইল যে, পূর্ব্ব সীমান্তে পর্ব্বতারণ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে, অজ্ঞান সরল পার্ব্বত্যজাতি বিদেশীর আক্রমণে জর্জ্জরিত, বিধ্বস্ত; তাহাদের সাহায্যার্থে তাহাকে এইক্ষণে যাত্রা করিতে হইবে, নতুবা সে নবশিশুকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত।

উঠান ভরা জল দাঁড়াইয়াছে, মুশল ধারে বৃষ্টি। সন্ন্যাসী ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তা সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, গাছের পাতাগুলি নাড়া

দিয়া ঝড়ের বাতাস আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছে। সম্মুখে দীঘির জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, ছোট ছোট ছিন্ন ডাল গাছের বুক ভাঙিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। ঘরের মটকা চড় চড় করিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে চোখের সাম্‌নে ধাঁধা লাগে। কড় কড় শব্দ করিয়া একটা ভীষণ বজ্রপাত হইল। কর্ত্তা চক্ষু বুজিলেন, বাড়ীর সীমানার ভিতর হইতে ঝড়ের গর্জ্জনের শব্দ ভেদ করিয়া একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ উঠিল। দেখিলেন বাগানের এক কোণে একটা বড় তালগাছ একবার একটু জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার মাথাটা মাটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভিতর বাড়ী হইতে আবার ভৃত্য বংশী আসিয়া খবর দিল, বড়দিদি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। কেমন যেন করছেন, মেয়েরা সব কান্না জুড়ে দিয়েছে।

কর্ত্তা চোখ বুজিয়াই উত্তর দিলেন, আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি।

দিক্ আলো করিয়া কালো মেঘ আর একবার বিদ্যুৎ হানিল। তারপর বৃষ্টি যেন একটু ধরিয়া আসিল। আকাশ সাদা হইয়া উঠিয়াছে।

বংশী ছাতি ধরিয়া কর্ত্তাকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া গেল। কর্ত্তা উপস্থিত হইতেই সমস্বরে কান্নার রোল উঠিল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া কর্ত্তা বড় মেয়ে শোভনার ঘরে গিয়া দেখিলেন, শোভনা মূর্চ্ছাহতা হইয়া পড়িয়া আছে, মুখে ভয়ের চিহ্ন, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়াছে।

ঠাণ্ডা জলের ঝট্‌কা দিয়া বহু চেষ্টার পর শোভনার মোহ ভাঙ্গিল। প্রথম চক্ষু চাহিয়া সে তাহার বাবাকে কাছে ডাকিল। কর্ত্তার মাথাটি আস্তে আস্তে নোয়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কানে কানে বলিল, বাবা, এ বাড়ীতে থাকতে আমার বড় ভয় করে। দিনে রাত্রে কে যেন দু'চোখ পাকিয়ে আমাকে কেবল শাসায়।

অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া কর্ত্তা তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

বাড়ীর বুড়া ঝি কর্ত্তার চাইতেও বয়সে বড়। এখন আর বিশেষ কোনও কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, তবু পুরান সংসারে তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ। বুড়ী কখনও কখনও গল্প করিত, তাহার একটি ছেলে ছিল, বাঁচিয়া থাকিলে কর্ত্তার মতই বড়টি হইত। কিন্তু আঁতুড় ঘর হইতেই কেমন করিয়া একদিন হারাইয়া যায়। তাহার পর বহু চেষ্টাতেও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। বুড়ী তাই কর্ত্তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করিত। কর্ত্তার কোনও মতে একটু অযত্ন হইলে বুড়ীর আর অধৈর্য্যের সীমা থাকিত না। এমন কি বাড়ীর গিন্নীও যদি কখনও কর্ত্তার কোনও কাজে অবহেলা করিতেন তাহা হইলে বুড়ী বেশ একটু জোর গলায়ই বলিত, আগে মাথা বাঁচাও তবে আপনি বাঁচবে।

বুড়ী মনে মনে তার নিজের আঁতুরের ছেলেটির নাম রাখিয়াছিল—নীলাম্বর। লোকে তাই জানিয়া তাহাকে নীলাম্বরের মা বলিয়াই ডাকিত।

নীলাম্বরের মা কর্ত্তাকে হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে প্রসূতির ঘরের দিকে লইয়া চলিল।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, কি করছ নীলাম্বরের মা?

বুড়ী মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, আগে সোনা বের কর। ছেলে ত নয় রাজপুত্তুর—একখানা পুরো গিনি চাই।

অনেক আপত্তি করিয়াও কর্ত্তাকে রাজপুত্র দেখিতে হইল এবং একখানি গিনিও দিতে হইল।

নীলাম্বরের মা'র কথা ঠেলিবার উপায় নাই।

ছেলে দেখিয়া কর্ত্তার সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। সত্যই ছেলেটি সুলক্ষণ যুক্ত।

আর একবার আকাশে বিদ্যুৎ হানিল। শিশু চোখ বুজিয়াই একবার মৃদু হাসিল।

কর্ত্তা মনে মনে ছেলের নাম রাখিলেন—দীপক।

(৩)

লুসাই যুদ্ধ বাধিয়াছে। সরকার হইতে হুকুম আসিল, কর্ত্তাকে দেশ হইতে ঘোড়া, গরু ও গাধা সংগ্রহ করিয়া

যুদ্ধে সরবরাহ করিতে হইবে। শহরে থাকিয়া তাহা চলে না। কর্ত্তাকে গ্রামে গ্রামে ফিরিতে হইল। এক বৎসর নিমেষে কাটিয়া গেল।

দীপকের এখন এক বৎসর বয়স। সমারোহে নাম-করণ ও অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। খোকার দীপক নামই বহাল রহিল।

বেশীর ভাগ সময়ই কর্ত্তা বাহির বাড়ীতে কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। বাড়ীর লোকেরা কেহ তাঁহাকে কাজে ব্যাঘাত করিতে সাহস পায় না। এক বৎসরের শিশু দীপক সে কথা বোঝে না। সে কর্ত্তার কাছে যাইবে বলিয়াই বায়না ধরে। মাঝখান হইতে বিপদে পড়িতে হয় বংশীকে। খোকাকেও কর্ত্তার কাছে লইয়া যাইতে হয়, আবার তাহার জন্ত কর্ত্তার নিকট হইতে যা'কিছু গাল মন্দ তাহাকেই শুনিতে হয়।

এ বাড়ীর অনেক ছেলে মেয়েকেই বংশী কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কিন্তু এমন জ্বালাতন কোনও ছেলেই করে নাই। ছেলে মানুষ করিয়া বংশী বুড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু এ ছেলের ভাব কিছু সে আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

কর্ত্তা বাড়ীতে থাকিলে যেন ছেলেটা টের পায়। যতক্ষণ কর্ত্তা বাড়ীতে থাকেন, ছেলে বাইরেই থাকিতে চায়। কর্ত্তার পায়ের কাছে বসিয়া জুতা লইয়া খেলে, নয় ত কর্ত্তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুষিয়া চুষিয়া কর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে; তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য না করিলে সে আবার কাঁদিয়া উঠে। কর্ত্তা বিপদ গণিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া হাঁটুর উপর বসাইয়া দেন।

নিজের আফিসের কাজের উপরে এটা উপরি কাজ। তাই সকালে ও রাত্রে তাঁহার বাড়ীতেই যুদ্ধের আফিস বসে—গরু ঘোড়ার হিসাব চলিতে থাকে। শুধু জন্তুগুলিরই নয়, হিসাব আরও রাখিতে হয়। তাদের দানা পানি সহিস লস্কর ইত্যাদি—মায় সঙ্গের কেরানী বাবুর চালান পর্য্যন্ত।

কর্ত্তা রাগিয়া গেলে দীপক তাঁহার লিখিবার কাগজ ধরিয়া টানে, নয়ত এমন একটা কিছু করিয়া বসে যে, কর্ত্তাকে বাধ্য হইয়া আবার বংশীর কোলে চড়াইয়া তাহাকে ভিতর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হয়। এতেও ছোট খাটো একটি যুদ্ধ বাধে। দীপক বংশীর কোলের উপর হইতে বিপুল চীৎকারে হাত পা ছুঁড়িয়া গলিয়া পড়িতে চায়। বংশী বেশ একটু অন্তর টিপুনী দিয়া খোকাকে বশে আনিতে চেষ্টা করে। খোকা আরও জোরে চেঁচাইয়া উঠে। এদিকে বাড়ীর ভিতরে নীলাম্বরের মা বংশীর ও তাহার সঙ্গে সাতগুষ্টীর পরপারে যাত্রার আয়োজন করে।

বাড়ীর ভিতরে পৌছিয়া খোকার অন্ত এক রূপ। হাসিয়া মায়ের কোলে ঝাপাইয়া পড়িয়া বলে, মা ঘোড়া যাব।

খোকার দোষ নাই। সে কিছু দিন ধরিয়া বংশীর কোলে চড়িয়া রোজ সকালে ঘোড়া গরুর শোভাযাত্রা দেখে। এক রাত্রি প্রবাসে বাস করিয়া প্রতিদিন প্রত্যুষে বিস্তর ঘোড়া, মহিষ ও গরু সার বাঁধিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করে। হয় ত তাহারাও রাজার জন্য যুদ্ধ করিতে যাইতেছে মনে করিয়া বেশ উল্লাসেই সার বাঁধিয়া চলে। প্রথমে একটি ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা—প্রভাতের সেই শুব্ধ অম্বর অনুরণিত করিয়া ঘোড়ার গলার ঘণ্টা বাজে ঢং—ঢং—ঢং তাহারই সঙ্গে করুণ সুরে বাজে মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ঘণ্টা টিং রিং টিং টং। তাহার পর ভারতীয় সৈন্যের মত সহস্র সহস্র নির্ব্বাক প্রাণী যুদ্ধে প্রাণ দিতে জাহাজ ঘাটার দিকে চলে। খোকা সেই মিশ্রিত শব্দ-ঝঙ্কারে মাঝে মাঝে পুলকে উল্লসিত হইয়া উঠে। প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা ধরিয়া এইরকম চলিতে থাকে। কর্ত্তার শ্রান্তি আসিলেও খোকার আনন্দের বিরাম নাই। পশুর দলের সঙ্গে সঙ্গেই বালতি, বস্তা, তাঁবু লট্‌-বহর বোঝাই হইয়া কতকগুলি মানুষ-পশুও চলিতে থাকে। খোকা তাহাদের দেখিয়া কি ভাবে কে জানে, কিন্তু তাহার মুখের রং যেন একটু বদলাইয়া যায়। সবার শেষে একটি ঘোড়ায় চড়িয়া একটি গোরা সাহেব খাকি পোষাক, মাথায় টুপীর উপর পালকের মোহন চুড়া, গো-পাল ও ভারতীয় মানুষের পাল তাড়াইয়া লইয়া চলে। কর্ত্তা তাহারই হাতে একখানি

করিয়া লেপাফা গুজিয়া দেন্। সে টুপীর কোণে হাত ঠেকাইয়া বুক চিতাইয়া সেলাম করে—খোকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বোধ হয় সাহেবের সেলামের অন্ত কোনও অর্থ ধরিয়া লয়।

বংশীর কাছেই নানা কথা শুনিয়া খোকার ঘোড়ায় চড়ার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। খোকার এই আব্দার নীলাম্বরের মা যতদিন বুঝে নাই ততদিন তবু রক্ষা ছিল; কিন্তু নীলাম্বরের মা একদিন যেন খুব সহজেই খোকার এই নূতন আখোটটি বুঝিয়া ফেলিল এবং পত্র-পাঠ কর্ত্তার উপর আদেশ জারী হইল, খোকার জন্য একটি ছোট্ট ঘোড়া চাই। একটি বাচ্ছা ঘোড়া আসিল। শাদা ধবধবে রং—তার উপর বাদামী ছাপ কাটা। চোখের পাতাগুলিও শাদা শাদা, কিন্তু চোখটা লাল।

কিছুদিনের মধ্যেই খোকা ও বংশীর সঙ্গে 'চাঁদার' পরিচয় হইয়া গেল। শেষ কালটায় এমন হইল যে, খোকা তাহার কেশর ধরিয়া টানিলে চাঁদা-টা চিঁহি করিয়া ডাকিয়া উঠিত। পুচ্ছ দোলাইয়া খোকার সঙ্গে রঙ্গে মাতিত। খোকামণি জীনে চড়িয়া কোন্ সাগর-বালার সন্ধানে যাত্রা করে তাহা সে-ই জানে। কিন্তু তার সঙ্গে বংশীকে বাড়ীর ঝগড়া ঝাঁটি ফেলিয়া রাজপুত্রের সহচরের উপযোগী গাম্ভীর্য্য ও অপার ধৈর্য্য লইয়া প্রতিদিন পাশে পাশে চলিতে হয় এই যা বিপদ। সোনার রথে চড়িয়া দিনান্তের সূর্য্য দীঘির জলে কোন্ মায়াপুরীর পানে মেঘের জুড়ী ছুটাইয়া দেয়—খোকার মনের কথা সে-ই জানিয়া লয়। খোকা বাড়ীতে ফিরিয়া মা'র কোলে সোনার তরীতে দোল খায়! মায়ের বুকে সাগর দোলে, কোন্ অতলে সে মায়াপুরী—খোকা স্বপ্নের কবচ আঁটিয়া সে অতলেই নামিয়া পড়ে। খোকার চোখ বুজিয়া আসে।

(৪)

আট বছরের দীপক বাবার সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যাবেলা যখন মা'র কাছে ফিরিয়া আসে তখন বাবার কথা বাহিরের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। খোকা এখন বড় হইয়াছে, ধুতি পরিয়াই ঘুমান চাই!

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া মা'র মুখের চুমা লওয়া তাহার আর একটি নিত্য কাজ ছিল। এখন সে আর কোলে চড়ে না, বংশীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখে,—বাড়ীর হাঁস-গুলি একথালা ভাত-জল কেমন নিমেষে খাইয়া ফেলে;—একজনের ঘাড়ে একজন চড়িয়া, কাহারও গলার তলায়, বুকের তলায় মাথা গলাইয়া দিয়া যে যার ভাগের ভাগ খাইয়া লয়—শুধু জলটুকু থালায় পড়িয়া থাকে।

খাওয়া শেষ হইলে বংশী তাদের এক তাড়া দেয়। প্যাক্ প্যাক্ করিতে করিতে তাহারা দীঘির জলে নামিয়া পড়ে। তারপর জলের উপর গা-ভাসান দিয়া তাহাদের আরামের বহর দেখে কে! খোকা তীর হইতে ডাকে—আয় আয়, চৈ—চৈ—হাঁসগুলি মাথা ডুবাইয়া পা উঁচু করিয়া খেলা জুড়িয়া দেয়। খোকাও দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠে।

বেলা হইয়া যায়, নীলাম্বরের মা ভাত লইয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দেয়, খোকার কানের কোণ্ দিয়াও সে ডাক পৌছায় না। বংশীর এতেও বিপদ! নীলাম্বরের মা'র অবিশ্রান্ত গাল মন্দগুলি একদিক হইতে ভাসিয়া আসে, অন্যদিকে খোকা বাবুর হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়াও তাহাকে ঘর-মুখো করিতে পারে না! কোথায় কোন্ মাছরাঙাটা ছপ্ করিয়া রামধনুর রেখার মত সাতরঙা ডানা দুটি মেলিয়া জলে ছোঁ মারিল, খোকার নজর সেই দিকে। জলের ধারে ধারে কোথায় কোন্ শাদা বক্‌টা লম্বা ঠোঁট্‌টি নিমেষের জন্য জলে ছোঁয়াইয়াই রূপার টুকরার মত ছোট একটা মাছ তুলিয়া লইল, খোকার চোখ তাহাই খুঁজিয়া ফিরে। মৃদুল বায়ে দীঘির জল লহর তুলিয়া কিনারে লাগে, ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তাহাকে খেলায় ডাকে, খোকা সাত নায়ে উনপঞ্চাশ দাঁড়ী লাগাইয়া মন-সাগরে পাড়ি লাগায়—তবু জলের কাছে পৌঁছিতে পারে না!

যদি বা খাওয়া দাওয়ার পর বহু চেষ্টা করিয়া নানাম্ গল্প বলিয়া, মাথা চুলকাইয়া দিয়া নীলাম্বরের মা তাহাকে একটু ঘুম পাড়াইয়া গেল, বৃহৎ পরিবারের সকলের মধ্যাহ্ন তন্দ্রার সাজ হইতে না হইতে দীপক চুপ্ চাপ্ গুড়ি গুড়ি লটান মালীর ঘরের দিকে চলিয়া যায়।

মা ঘরে আসিয়া খোঁজ্ খোঁজ্—বাড়ী সুদ্ধ হট্টগোল! কোথায় খোকা, কোথায় খোকা ?—খোকা মালীর ঘরের চৌকাঠে বসিয়া মালীর সঙ্গে গল্প ফাঁদিয়া দিয়াছে!

বংশী আসিয়া যখন চীৎকার করিয়া বলে, এই যে খোকা বাবু! অমনি দীপকও হাসে মালীও হাসে, তার সঙ্গে হাসে মালীর একটা ছোট মেয়ে। তার নাক খাঁদা, চোখ ছোট, কপাল উঁচু, তবু খোকা গল্প শুনিতে শুনিতে তাহারই দিকে চাহিয়া হাসে।

বংশীর ভয় বুঝি বা খোকা জলে ডুবিল!

বৈঠকখানার এক কোণে বাইরে একটা মস্ত বড় আম গাছের নীচে চন্দা আর খোকার খেলা চলে। চন্দা রাঁধে বাড়ে। খোকা মালীকে দিয়া কলা গাছের ডিগ্ কাটাইয়া তাহারই উপর চড়িয়া ঘোড়-সওয়ার হইয়া আসে। তারপর ঘোড়ার উপর চড়িয়াই কোনও মতে চন্দার হাতের রাঁধা ধূলার ভাত, ভাঙ্গা খোলার মাছ ও পাতার তরকারী খাইয়া সপাং করিয়া এক চাবুকে ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। চন্দা আবার রাঁধে বাড়ে। আপনি খায়, খোকা-খুকুদের খাওয়ায়। গিন্নী-বান্নির মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কোমর বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গে। খোকা ততক্ষণ ঘোড়া ছুটাইয়া, মুখে টক্ টক্ শব্দ করিতে করিতে উঠানটুকুর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাজ্যের পর রাজ্য পার হইতে থাকে। নীলাম্বরের মা এক এক দিন রাত্রে গল্প বলিতে বলিতে এমনি করিয়া এক এক রাজপুত্র কোটালের পুত্র বা উজীর পুত্রকে রাজ্যের পর রাজ্য জয়ে পাঠাইয়া দেয়! খোকা তাহাই মনে করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া আবার আফিস করিতে বসেন। কোচ্ম্যান্ ঘোড়াটাকে চক্কর ফিরাইয়া উঠানে আনিয়া দানা খাইতে দেয়। খোকাও বৈঠকখানা হইতে ছুট দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে দেশী কুকুর টম্‌টাও। কুকুরের নাম রাখিতে হইলে তখনকার দিনেও লোকে সাহেবী নামই রাখিত। দানা খাইতে খাইতে ঘোড়াটা টম্-এর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নাক দিয়া ফড়্ ফড়্ করিয়া শব্দ করিত, টম্ তাহাতে আরও ঘেউ ঘেউ করিয়া ঘোড়াটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। এমনি দ্বন্দ্ব রোজ হইত। খোকা বাবু হাত তালি দিয়া টম্‌কে শান্ত হইতে বলিত। কে শোনে কার কথা। তারপর খোকা আর টম্ উঠানময় ছুটাছুটি। বংশী সামলাইতে বিব্রত;—এই পড়ে, এই হাত ভাঙ্গে, এই বুঝি বা ঘোড়াটার পায়ের তলায়ই আসিয়া পড়ে! মিউ মিউ করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর হইতে একটা বিড়ালও খেলিতে আসে।

খেলিতে খেলিতে দীপক দশ বছরে পড়িল।

যুদ্ধ প্রায় শেষ। পাহাড়ীরা যত হটে, ইংরেজ ততই তাহাদের পেছু লয়। পাহাড়ীরা তাহাদের নিজের স্বার্থের কথা যাহা বুঝে না ইংরেজ তাহাদের তাহাই বুঝাইতে চায়, কিন্তু অসভ্য পাহাড়ীরা ভদ্রলোকের মত তাহা মানিতে চায় না। হটিতে হটিতেই সুবিধা পাইলেই আবার বন-বাঁদাড়ের আড়াল হইতে হঠাৎ লাফাইয়া পড়িয়া দু'দশ জন হিতকারী বন্ধুদের কাটিয়া ফেলে। ইংরেজ তাহাদের ভাল করিবে বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; তাহারা নাছোরবান্দা!

তারপর একদিন সত্য সত্যই পার্ব্বত্যদের রাজা স-মিত্র আসিয়া ইংরেজের উপকার স্বীকার করিল। কর্ত্তার অনেক কাজ কমিয়া গেল। দেশের অনেকগুলি গরু ঘোড়া মানুষও কমিল। ইংরেজের কমিল ভয়, আর বাড়িল রাজস্ব।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে কর্ত্তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক বৎসর পরে দিন তিনেকের একটা কি অসুখে তিনি মারা গেলেন। সাহেব ডাক্তার হইতে দেশী ছোট-বড় ডাক্তার

কেহই বলিল না বা বলিতে পারিল না কি রোগে কর্ত্তার মৃত্যু হইল।

খোকার তখন এগার বছর বয়স, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া তাহার মনে হইল তাহার বয়স যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মৃতদেহের সঙ্গে সেও শ্মশানে গেল। চোখের সামনে মস্ত বড় একটা আগুন জ্বলিতেছে। তাহার বাবা তাহারই মধ্যে শুইয়া আছেন।

আগুন নিভিল। সবাই বাড়ী ফিরিল, খোকা পেছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, বাবা আসেন কি না।

—ক্রমশ

আমারে ভুলিও ভাই

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি এসেছিনু পথ ভুল করি' তোমাদের খেলা-গেহে,
স্নান করিবারে তোমাদের ভিজা অশ্রুজলের স্নেহে ;
আমারে ভুলিও ভাই,
ভালো যদি বাস, ভুলিবার মত সহজ কিছুই নাই।
দিনের আলোকে আঁধার ভুলেছ, ভুলেছ রাতের তারা,
নিদয় নিদাঘে ভুলেছ যেমনি নেমেছে শ্রাবণ-ধারা।
ঘুমের ঘোমটা টানিয়া ভুলেছ জাগর-জ্বালার দাহ,
নীলিমা ভুলেছ মেলিয়াছে পাখা যবে কালো বারিবাহ।
আমারে যাইও ভুলি',
শীতের শিয়রে দখিনার তরে বাতায়ন দিও খুলি'।
ঘরে নিয়ো নাক' শুকাল যা মাঠে নীবারের মঞ্জরী,
তুলো না সে ফুল কাঁটায় যাহার বৃন্ত গিয়াছে ভরি।
যে পাখী ভুলিল গান,
পিঞ্জর হতে তোমরা তাহারে দিও গো পরিত্রাণ।
তোমরা হেথায় অশ্রুবেলায় বাঁধিও বালির বাসা,
প্রিয়ার নয়নে হেরিও গোপনে সে ভালোবাসার আশা।
আমি আসিবনা ফিরে,
আমি চলে যাই তীর্থপথিক তিমিরতমসাতীরে ॥

বীরবল

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

আমি সেদিন দিল্লী গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে, আর্য্যাবর্ত্তে আমি "বীরবল" বলে পরিচিত, অবশ্য শুধু প্রবাসী বাঙালীদের কাছে। এ আবিষ্কারে আমি উৎফুল্ল হয়েছি, কি মনক্ষুণ্ণ হয়েছি, বলা কঠিন। লেখক হিসেবে আমি যে বাঙলার বাইরেও পরিচিত, এ ত অবশ্য অহ্লাদের কথা; কিন্তু আমার ধার-করা নামের পিছনে যে আমার স্বনাম ঢাকা পড়ে গেল, এইটি হয়েছে ভাবনার কথা। কারণ আমি স্বনামেও নানা কথা ও নানারকম জিনিষ লিখি। এর পর আমি যে কেন ও-নাম আত্মসাৎ করেছি, ও বীরবল লোকটি যে কে ছিলেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াটা আমি আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

আমি যখন বালক' তখন আমার পিতার কর্ম্মস্থল ছিল বেহার। কাজেই তিনি সেকালে বছরের বেশীর ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আর আমি বাস করতুম বাঙলায়, স্কুলে পড়বার জন্য। আমার বিশ্বাস এর কারণ, বাবা মনে করতেন বেহারের আব্-হাওয়ায় মানুষের মাথা তাদৃশ খোলে না, যাদৃশ ফোলে তার দেহ।

এর ফলে তিনি আপিসের পূজোর ছুটিতে বাঙলায় আসতেন, আর আমরা কেউ কেউ বেহারে যেতুম স্কুলের শীতের ছুটিতে;

আমার বয়েস যখন এগারো বছর, তখন একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুর যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমিই ছিলুম সব চাইতে বয়োকনিষ্ঠ। দিনটে একরকম খেলাধূলোয় কেটে যেত। সন্ধ্যের পর বাড়ীর জন্য মন কেমন করত।

বাবা তাই ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড একটা "আঙ্‌ঠি" জ্বালিয়ে, তার চারপাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উর্দ্দু বই থেকে আমাদের "কেচ্ছা" পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে সুরু হত—"আকবর বীরবল নে পুছা"; আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।

(২)

আমি তখন তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পারগামী হয়েছি, সুতরাং আকবর শাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, এ কথা আমার জানা ছিল।

কিন্তু বীরবল লোকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম; কারণ তারিণীচরণ তাঁর নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু সেই সব উর্দ্দু কেচ্ছা শোনাবার ফলে আমার মনে বীরবলের নাম বসে যায়। আকবরের প্রশ্নর উত্তরে বীরবলের চোখা চোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে ক'জন? আর যে পারে, আমার বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্ত্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে। মুখের চাইতে হাত যে বড় হাতিয়ার, বুদ্ধিবলের চাইতে বাহুবল যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা আমি তখন বুঝতুম না;

কারণ সে বয়েসে আমি সভ্য হইনি, ছিলুম শুধু আদিম-মানব। সেকালে বাহুবলের একমাত্র পরিচয় পেতুম গুরুজনদের ও গুরুমহাশয়দের বাহুতে। জোয়ান লোক-দের কর্তৃত্ব ছোট ছেলেদের গালে চপেটাঘাত ও কর্ণমর্দ্দনের মাহাত্ম্য ও-বয়েসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আমাদেরই ভালর জন্য তাঁরা আমাদের কানের রঙ লাল করে দিচ্ছেন, ও আমাদের গালে তাঁদের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ দেগে দিচ্ছেন, তা বোঝবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি তখন আমার ছিল না। এই পরোপকারের চেষ্টাটা সেকালে অত্যাচার বলেই রক্তমাংসে অনুভব করতুম। তাই তখন মনে ভাবতুম—হায়! আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তাহলে এই সব ঘরো আকবর শাহদের বোকা বানিয়ে দিতুম। দুর্ব্বলের উপর বলপ্রয়োগের নামই যে বীরত্ব, তা বুঝলুম ঢের পরে—যখন Carlyle-এর Hero-Worship পড়লুম।

(৩)

এর পর বহুকাল যাবৎ বীরবলের নাম আমার গুপ্ত চৈতন্যে গুপ্ত হয়ে ছিল। আমার যখন পূর্ণযৌবন, তখন আবার তা জেগে উঠল। বিলেতে আমার অনেক মুসলমান বন্ধু জোটে; তাঁদের কারও বাড়ী লক্ষ্ণৌ, কারও দিল্লী, কারও নাগপুর, কারও হাইদ্রাবাদ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আবার নবাব-জাদা।

এই সব বন্ধুদের মুখে বীরবলের রসিকতার দেদার গল্প শুনি। এ সব রসিকতা যে অন্য লোকের বানানো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এ সব গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রমাণ করা যে, আকবরের সভায় বীরবলের চাইতেও আর একজন ঢের বড় রসিক ছিলেন, যিনি কথায় কথায় বীরবলকে উপহাসাস্পদ করতেন। এই রসিকরাজের নাম হচ্ছে মৌলবী দো-পিঁয়াজা। উক্ত মৌলবী সাহেবের সুভাষিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করে নি, তার কারণ তাঁর রসিকতা তাঁর নামেরই অনুরূপ তীব্রগন্ধী। সে রসিকতা শুনে যুগপৎ কানে হাত ও নাকে কাপড় দিতে হয়।

এই সব কেচ্ছা শুনে আমার এই ধারণা জন্মালো যে, বীরবল ছিলেন আকবর শাহের বিদূষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দু। বিদূষক হিসেবে তিনি হিন্দুস্থানে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন বলে তাঁর পাল্টা জবাব দিতে পারে এমন একজন মুসলমান রসিক কল্পিত হয়েছে। তাঁর নামই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোনও মৌলবী আকবর শাহের সভাসদ হতে পারত না।

সে যাই হোক্ বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুটি স্পষ্ট গুণ আছে। প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়ত শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি; সুতরাং তাঁদের এতে খুসী হবারই কথা। আর মুসলমান ভ্রাতৃগণের কাছে নিবেদন করছি যে, আমি যত বড়ই রসিক হই না কেন, মৌলবী দো-পিঁয়াজার নাম গ্রহণ করা আমার শক্তিতে কুলোয় না। ইংরাজীশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান অকাতরে পলাণ্ডু ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে পলাণ্ডু বলে ভদ্রসমাজে পরিচিত করতে পারে না। জাতি জিনিসটে এমনি বালাই।

(৪)

মৌলবী দো-পিঁয়াজার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু বীরবল যে এককালে সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; কারণ আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক মৌলবী সাহেবেরা তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা খুব ফুর্ত্তি করে' করেছেন। যার মৃত্যু হয়েছে, সে অবশ্য এককালে বেঁচেছিল। তিনি আকবর শাহের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলে আকবরের বহু প্রসাদবিত্তদের তিনি সমান অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর ইতিহাসে সেই ব্যক্তিরই নাম স্থান পায়, যে নিন্দা-প্রশংসা দুয়েরই সমান ভাগী! বীরবলের ভাগ্যে দুইই যে সমান জুটেছিল, তার পরিচয় পরে দেব।

জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক ফার্সি ভাষার সব পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে বীরবলের আসল নামধাম উদ্ধার করেছেন। বীরবল নামটিও রাজদত্ত।

বীরবলের প্রকৃত নাম ছিল মহেশ দাস। তিনি

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে কাল্পী নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রথমে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের আশ্রয়ে বাস করতেন, পরে রাজা বাহাদুর তাঁকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহেশ দাসের কবিতা, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর রসালাপ, তাঁর গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁকে কবিরায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিকরা তাঁকে কখন আকবরের মন্ত্রী, কখন বা প্রধান মন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকবর শাহ তাঁকে রাজা বীরবল উপাধি দেন, এবং সেই সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের কালাঞ্জর রাজ্য ও কাঙ্গরা প্রদেশ জায়গীর দেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বীরবলকে সেনাপতি করে কাবুল যুদ্ধে পাঠান, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হস্তে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন।

(৫)

এই সব তথ্য আমি ইংরাজ ঐতিহাসিক Vincent Smith-এর Akbar The Great Moghul নামক পুস্তক হতে সংগ্রহ করেছি। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বীরবলের প্রতি মৌলবী সাহেবেরা যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; এবং এ অসন্তোষের কারণও ছিল। আবদুল কাদির নামক আকবর শাহের জনৈক ঘোর সুন্নি সভাসদের "তারিখ-ই বাদাউনী" নামক পুস্তকের একবার পাতা উল্টে গেলেই দেখতে পাবেন যে, তার প্রায় পাতায় পাতায় বীরবলের উপর গালিগালাজ আছে। এমন কি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মৌলবী সাহেব বীরবলের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন না, তার পূর্ব্বে "দাসীপুত্র" বিশেষণটি জুড়ে না দিয়ে। মৌলবী সাহেবের রাগের কারণ পরে উল্লেখ করব। এ স্থলে একটি কথা বলে রাখা দরকার। আকবর শাহের আমলের যত ইতিহাস ফার্সি থেকে ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে "তারিখ-ই বাদাউনী"ই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রথম কারণ মৌলবী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। দ্বিতীয়তঃ, তার মনে রাগদ্বেষ ছিল বলে তার লেখায় নুন-ঝাল দুই আছে; অপরাপর ইতিহাসের মত তা পানসে নয়। তা ছাড়া, তাঁর গ্রন্থ ইতিহাস না হোক, সাহিত্য। যদিচ বহিখানির নাম "তারিখ," তাহলেও সেটি শুধু chronology নয়, অর্থাৎ পাঁজি নয়, পুঁথি। তিনি যাঁদের নাম করেছেন, তাঁদেরই চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আকবর, আবুল ফজল, ফৈজী, বীরবল প্রভৃতি তাঁর লেখায় শুধু নাম মাত্র নয়, রূপবিশিষ্টও বটে। তিনি মহা রাগী পুরুষ ছিলেন। তার জন্য দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই; কেন না কথায় বলে রাগই পুরুষের লক্ষণ। তাকে অবশ্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলা যায় না, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি ইতিহাসের দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। তিনি ভুল করতে পারেন, কিন্তু জেনেশুনে মিছে কথা বলেননি। বাদাউনী বলেছেন যে, বীরবল প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনিই বীরবল ও তানসেনকে তাঁর সভার দুটি রত্ন হিসেবে বাদশাহকে উপঢৌকন দেন। এই কথাই আমার বিশ্বাস সত্য।

বীরবলের উপর বাদাউনীর রাগ বোঝা যায়; কিন্তু Smith সাহেবও যে কি কারণে বীরবলের প্রতি বিরক্ত তা বোঝা কঠিন, কারণ তিনি মুসলমানও নন্, মুসলমান-প্রণয়ীও নন্। তা যে তিনি নন, তা যে-কেউ তাঁর Oxford History of India পড়েছেন, তিনিই জানেন। Smith সাহেব বীরবলকে অবশ্য দাসীপুত্র বিশেষণে বিশিষ্ট করেন না। কিন্তু ফাঁক পেলেই তিনি বীরবলকে আকবর শাহের ভাঁড় বলে উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি একাধারে কবি, গায়ক, গল্পচরিত্র, ও সুরসিক—তাকে শুধু Jester বলে উল্লেখ করে Smith সাহেব গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দেননি। Smith সাহেব বলেন যে, বীরবল যে আকবর বাদশার মন্ত্রী ছিলেন, এ কথা ভুল। তিনি অনুমান করেছেন যে, বীরবল ছিলেন আকবরের আস্তাবলের জমাদার। তাঁর ভাষায় "কবিরায়ের" ইংরাজী প্রতিবাক্য হচ্ছে Poet Laureate. টেনিসনকে ইংলণ্ডের রাজা তাঁর অশ্ব পালনে নিযুক্ত করেননি, আর এ দেশে আকবর বাদশা যে তাঁর কবিরায়কে ঘোড়ার খিদমত্‌গারীতে নিযুক্ত করেছিলেন, এমন কথা মৌলবী

বাদাউনীও বলেননি। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তিনি Akbar The Great হতেন না, হতেন শুধু Akbar The Moghul.

কিন্তু এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ আরও অদ্ভুত। আকবর ফতেপুরশিক্রীতে বীরবলের বাসের জন্য একটি বাড়ী তৈরী করেছিলেন, সে ইমারৎ আজও দাঁড়িয়ে আছে। সে বাড়ীর বর্ণনা Smith সাহেবের কথাতেই নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"The exquisite structure at Fatehpur Sikri, known as Birbal's house, was erected in 1571 or 1572. The beauty and lavishness of the decoration testify to the intensity of Akbar's affection for the Raja.

The proxmity of his beautiful home in the place of Fatehpur Sikri the stables, has suggested the hypothesis that he may have been Master of Horse."

বিলেতি লজিকের কোন্ সূত্র অনুসারে এইরূপ proximity থেকে এইরূপ hypothesis-য়ে পৌঁছনো যায়, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আমি Mill-এর Inductive Logic পড়িনি ; তাই আস্তাবলের পাশে যার বাড়ী সে-ই যে সহিস—এ কথা মেনে নিতে আমি কুণ্ঠিত। আলিপুরে লাটসাহেবের বাড়ীর পাশেই আছে পশুশালা—এর থেকে লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কিন্তু সহজ বুদ্ধির কাজ নয়।

বর্ত্তমান যুগে আমি একটিমাত্র ব্যক্তিকে জানি, যিনি একাধারে কবি, গায়ক, গল্পরচয়িতা ও সুরসিক ;—তাঁর নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বাড়ীর দু'হাত দূরে আস্তাবল আছে। আমি তাঁর কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন ও আস্তাবল অবিলম্বে ভূমিসাৎ করেন, নচেৎ ভবিষ্যতের Smith সাহেবরা তাঁর সম্বন্ধে কি যে hypothesis করবেন, তা বলা যায় না।

(৭)

বীরবলের মৃত্যুটি একটু গোলমেলে ব্যাপার। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আকবর শাহ যেমন শোকাতুর হয়েছিলেন, মৌলবী বাদাউনী প্রভৃতি তেমনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। Smith সাহেব এ মৃত্যুকে বলেছেন inglorious death ; কারণ যে যুদ্ধে তাঁর প্রাণ যায়, সে যুদ্ধে তাঁর সৈন্যসামন্ত প্রায় সমূলে নিপাত হয়। যুদ্ধে হারাটা দুঃখের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সব সময়ে লজ্জার বিষয় নয়। রাণী দুর্গাবতী আকবরের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যুদ্ধে হেরেছিলেন ও যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন ; অথচ ঐতিহাসিক মাত্রেই তাঁর মৃত্যুকে glorious death বলেছে।

Smith সাহেবের বিশ্বাস যে—

"The disaster appears to have been due in large part to his folly and inexperience. Akbar made a serious mistake in sending such people as Birbal and the Hakim to command military forces operating in a difficult country, against a formidable enemy."

(৮)

আকবর শাহের সভাকবি যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, একথা সহজেই মনে হয়। টেনিসনকে Crimea-র যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠালে যে একটা না একটা বিভ্রাট ঘটত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে বীরবল ত শুধু কবি ছিলেন না—উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদূষক ও গল্প-রচয়িতা। ভাসের অবিমারক নামক নাটকে পড়েছি যে, রাজপুত্র তাঁর বিদূষককে হারিয়ে এই বলে দুঃখ করেছিলেন যে, "আমার এমন বয়স্য গেল কোথায়, যে ঘরে ছিল নর্ম্মসচিব ও যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগণ্য যোদ্ধা"। অতএব বিদূষকও যে যোদ্ধা হতে পারে, তার সংস্কৃত নজির আছে।

আর গল্প-রচয়িতাও যে সেনাপতি হতে পারে, তার প্রমাণ Tolstoi ছিলেন Crimean War-য়ে রুষ-পক্ষের একজন সেনাপতি। সে যুদ্ধে রুষ-পক্ষ জয়লাভ করেনি ; এবং তারজন্য Tolstoi ইউরোপীয় সমাজে অবজ্ঞার পাত্র হননি। Crimea-তে রুষ-পক্ষের যত লোক যুদ্ধে প্রাণ

ত্যাগ করে, তার চাইতে ঢের বেশী সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ওলাউঠায়। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও-রোগের এমন ভীষণ প্রকোপ হয়েছিল যে, Tolstoi পাছে ও-রোগে আক্রান্ত হন এই ভয়ে, স্বয়ং Czar তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু Tolstoi সে আদেশ অমান্য করেন এই বলে যে, তিনি তার অধীনস্থ দীনহীন অসহায় সৈনিকদের এই বিপদের মধ্যে ত্যাগ করে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করতে প্রস্তুত নন, রাজার হুকুমেও নয়!

সুতরাং কাবুলের যুদ্ধ যে বীরবলের অজ্ঞতা ও কাপুরুষতার দরুণই হার হয়েছিল, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিশেষতঃ Smith সাহেব এই ঘটনা যখন আকবরেরও আহম্মকীর প্রমাণস্বরূপ গণ্য করেন, তখন তাঁর মত একেবারেই অগ্রাহ্য। ধরে নিচ্ছি যে, বীরবলের রসিকতাই আকবরকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ করা যে রসিকতা নয়, তা আর কেউ না জানেন, আকবর জানতেন। আর কোন্ লোকের দ্বারা কোন্ কাজ উদ্ধার হয়—তাও যে তিনি জানতেন, তার পরিচয় তিনি চিরজীবনই দিয়েছেন। সুতরাং Smith সাহেবের "It appears" কথাটার কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। Smith সাহেব কিন্তু শুধু বীরবলকে অজ্ঞ ও অক্ষম বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও বলেন যে—"He seems to have frankly run away in a vain attempt to save his life"

(৯)

Smith সাহেব এ সত্য কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? অবশ্য তারিখ-ই বাদাউনী থেকে! সুতরাং মৌলবী সাহেব বীরবলের মৃত্যু সম্বন্ধে কি বলেন, তা তাঁর মুখেই শোনা যাক্। বাদাউনীর কথা হচ্ছে এই—

"Birbal also, who had fled from fear of his life, was slain, and entered the row of. the' dogs in hell and thus got something for the abominable deeds he had done during his lifetime"

বাদাউনীর কথা যদি বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে হয়, তাহলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে নরকের কুকুরের দলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। অর্থাৎ জীবনে যিনি বাস করতেন ঘোড়ার সঙ্গে, মরে তিনি গিয়ে বাস করতে লাগলেন কুকুরের সঙ্গে। এ ঘটনা যে ঘটেনি তা বলা অসম্ভব, কারণ নরকে যে Birbal's House ঠিক কোন্ জায়গায় তা বাদাউনীও নিজচক্ষে দেখেননি, Smith সাহেবও দেখেননি। সুতরাং বাদাউনীর উক্তির শেষ অংশটা যদি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে অগ্রাহ্য হয়, তাহলে তার প্রথম অংশটা সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবসর থাকে।

শাস্ত্রে বলে "যঃ পলায়তে স জীবতি"। আর শাস্ত্রবচন যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ উক্ত যুদ্ধক্ষেত্র হতে যে দু'টি মুসলমান সেনাধ্যক্ষ পলায়ন করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই বেঁচেছিলেন। এই কারণে এ বিষয়ে আবুল ফজল্ তাঁর "আকবর নামা'য় যা লিখেছেন, "it seems to me" সেই কথাটাই সত্য। তাঁর কথা এই—In the conflict 500 men perished. Among them was Rajah Birbal, whose loss the Emperor greatly deplored'.

যদি Smith সাহেব বলেন যে. আবুল ফজলের উক্তি অগ্রাহ্য—কেননা তাতে বীরবলের প্রতি গালিগালাজ নেই; তাহলে বলি আবুল ফজল্ বলেছেন যে, বীরবল মরেছেন,—আর মরার বাড়া গাল নেই।

(১০)

বীরবল কি ভাবে মরেছিলেন,—শুয়ে কি বসে, দাঁড়িয়ে কিম্বা দৌড়তে দৌড়তে,—তা জানবার কোনরূপ কৌতূহল আমার নেই। আমি জানতে চাই তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু নয়। কেননা মৃত্যুতে আমরা সবাই এক; শুধু জীবনে বিভিন্ন।

তাঁর মৃত্যুর কথাটা তুলেছি এই জন্য যে, উক্ত ঘটনায় আর পাঁচজনে কতটা আনন্দিত বা দুঃখিত হন, তাঁর চরিত্র কতকটা অনুমান করা যায়।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একই সাক্ষ্য দিয়েছে। অপরপক্ষে বীরবলের মৃত্যুতে দেশের পাপ গেল মনে করে বাদাউনী প্রমুখ মৌলবীর দল তাঁদের উল্লাস যে কি রকম তারস্বরে ব্যক্ত করেছিলেন, তার পরিচয় ত বাদাউনীর পূর্ব্বোক্ত কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—বীরবল জীবনে যে সকল জঘন্য কাজ করেছিলেন, সেই সব পাপের শাস্তিস্বরূপ তিনি নরকের কুকুরশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। এই জঘন্য কাজগুলি কি?

আকবর শাহ স্বধর্মের মায়া কাটিয়ে স্বকল্পিত এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। বাদাউনীর বিশ্বাস বীরবলই তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট করে।

আকবরের সভায় মোল্লা মহম্মদ ইয়াজিজি নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে শুন্নি মতের নানারূপ নিন্দা করে বাদশাহকে শিয়ামতাবলম্বী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। পরে বাদাউনীর ভাষায়—"This man was soon left behind by Birbal, that bastard, and by Shaik Abu-l-Fazl" এদের কুপরামর্শে আকবর শাহ কতদূর ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তার পরিচয় বাদাউনীর বক্ষ্যমান কথাগুলিতেই পাওয়া যায়:—

"The daily prayers, the fasts and prophecies were all pronounced delusions, as being opposed to sense. Reason and not revelation was declared to be the basis of religion."

আর এ সবই বীরবলের কুবুদ্ধিতে। আকবর যে একজন Reason-এর ভক্ত অর্থাৎ Rationalist হয়েছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। কারণ বৈষয়িক লোকমাত্রেরই দার্শনিক হতে গেলেই Rationalist হয়। Rationalist হলে মানুষের মাথা খোলে না, কিন্তু তার হৃদয় খুব উদার হয়। আকবরেরও তাই হয়েছিল। তিনি Rationalist হবার পর প্রকাশ্য দরবারে বলেন যে,—"আমি পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণকে জোর করে মুসলমান করেছি, আর তারা প্রাণভয়ে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন বুঝছি যে, আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।" তাঁর এ কথায় সকলেই সায় দেবে।

(১১)

ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনের অথবা মতের কি বদল হয়, তাতে অপরের কিছু আসে না, যতক্ষণ সে অপরের ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ না করে। আকবর শাহ তাঁর নব মতানুসারে যে সব হুকুম প্রচার করেন, তার দরুণই স্বধর্ম্মানরত মুসলমানগণ ক্ষোভে আক্রোশে অধীর হয়ে উঠেছিল। Smith সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই সব নব রাজ-শাসনের যে ফর্দ্দ দিয়েছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি:—

(১) কোনও বালকের "মহম্মদ" এই নাম রাখা হবে না। যদি কারও নাম মহম্মদ থাকে ত তার সে নাম বদলে নতুন নাম দিতে হবে।

(২) তাঁর রাজ্যে কোনও নূতন মসজিদ কেউ নির্ম্মাণ করতে পারবে না—আর জীর্ণ মসজিদের কোনরূপ সংস্কার কেউ করতে পারবে না।

(৩) তাঁর রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। আর এ আজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড। উপরন্তু বৎসরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে, একশ দিন মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৪) তাঁর রাজ্যে দাড়ি কেউ রাখতে পারবে না, সকলকে তা কামাতে হবে।

(৫) পিঁয়াজ, রশুন ও গোমাংস ভক্ষণ তাঁর রাজ্যে নিষিদ্ধ।

(৬) উপাসনার সময় হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিচারে সকলকেই পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ ধারণ করতে হবে।

এই রকম আরও অনেক খামখেয়ালি রাজাজ্ঞা তিনি প্রচার করেছিলেন। পুঁথি বেড়ে যায় বলে সে সবের আর উল্লেখ করলুম না। Smith সাহেব বলেন যে,—

"The whole gist of the regulations was to further the adoption of Hindu, Jain and Parsee practices, while discouraging or positively prohibition essential Muslim rites."

Smith সাহেব যখন এ সকল বিধি নিষেধকে silly regulations বলেছেন, তখন বাদাউনী যে তাকে abominable deeds বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর rationalist-এর এই সব বাদশাহী পাগলামির জন্য বাদাউনী বীরবলকেই প্রধানতঃ দায়ী মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ফৈজী, আবুল ফজল্ ও বীরবল, এই তিন গ্রহ একত্র মিলে আকবরের কুবুদ্ধি ঘটায়; আর এ তিনের মধ্যে শনি ছিলেন বীরবল।

(১২)

অপরপক্ষে সেকালের হিন্দুরা যে বীরবলের মহাভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় কেশবদাসের কবিতায়। আকবর শাহের আমলে তুলসীদাস প্রমুখ অনেক হিন্দী কবির আবির্ভাব হয়; কেশবদাস তাঁদের অন্যতম। কেশবদাস রামসিংহ নামক বুন্দেলখণ্ডের জনৈক রাজার ভ্রাতা ইন্দ্রজিৎ সিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি "রসিকপ্রিয়া" নামক একখানি কাব্য হিন্দীভাষায় রচনা করেন। হিন্দীভাষীরা এ কাব্যকে আজও হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের একখানি রত্ন বলে মনে করেন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনে কেশবদাসের শোক নিম্নলিখিত শ্লোকরূপ ধারণ করে :—

পাপ কে পুংজ পখাবজ কেসব সোককে সংখ শুনে সুষমা মেঁ।
ঝুটকী ঝালরি ঝাঁঝ অলীককে আবঝ জুথন জানি জমা মেঁ॥
ভেদ কি ভেরী বড়ে ডরকেডফ কৌতুক ভোকলিকে কুরমা মেঁ।
জুঝত হী বলবীর বজে বহু দারিদ কে দরবার দমামেঁ॥

আন্দাজ করছি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের কথা এই যে,—কেশব পাপপুঞ্জের পাখোয়াজ আর শোকশঙ্খের সুষমা শুনতে পাচ্ছে। মিথ্যা কথার কাঁসর বাজছে, আর জানি যে অলীকের আওয়াজ যেখানেই পশুপাল জমা হচ্ছে সেখানেই শোনা যাচ্ছে। ভেদের ভেরীর ভয়ঙ্কর জোর ডঙ্কা বাজছে। কলি কুকর্ম্মে বড় কৌতুক লাভ করেছে। কিন্তু বহু দরিদ্র লোকের দরবারে বীরবল যুদ্ধ করেছেন ও তাঁর নামের দামামা বাজছে।

হিন্দী ভাষা আমি শিক্ষা করিনি। সুতরাং আমার অনুবাদের মধ্যে এখানে ওখানে ভুল থাকতে পারে। তবে কবি কেশবদাসের মোদ্দা কথাটা বোঝা যাচ্ছে। বীরবলের মৃত্যুতে একদিকে মিথ্যা কথার ঢাক ঢোল ও ঘোর ভেদের ভেরী বেজে উঠেছিল। আর সেই ভীষণ ধ্বনির প্রতিধ্বনি ইতিহাসের মধ্যে আজও শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে আবার তেমনি শোকশঙ্খের ধ্বনিও লোকের কানে ও মনে বেজে উঠেছিল। বহু দরিদ্রের দরবার তাঁর সুযশ ঘোষিত হয়েছিল। যার মৃত্যুতে দরিদ্র সমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয়, তার জীবন ধন্য আর তার মৃত্যুও glorious death.

বীরবলের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যা নিবেদন করেছি' তার বেশি আর কিছু জানিনে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর নাম অবলম্বন করে আমি কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। আমি কবিও নই, গায়কও নই, গল্পরচয়িতাও নই। তারপর রাজ-দরবার আমি কখন দূর থেকেও দেখিনি। কাবুলে যুদ্ধ করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায়ও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তারপর আমি কাউকেও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করতে কখন প্ররোচিত করিনি। আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।

এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।

—সবুজপত্র

কল্লোল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১)
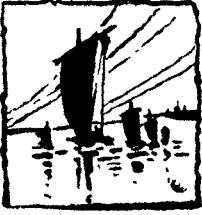
আমার ধারণা যে কল্লোল আনন্দতরঙ্গ। কল্লোল যে ব্যাপারখানা কি তা ঠিক জানিনা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাতাগুলি উল্টিয়া যাই, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, কল্লোলিনীর অর্থ স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বিনীর অর্থ নদী। যখন নগেন্দ্রদত্ত নৌকারোহণে নদীতে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন সেই নদী 'কুলকুল' করিয়াছিল। অকূল পাথারে 'কুলকুল' করা অসম্ভব। সেই জন্য জলধির কথা তুলিলেই 'গর্জ্জন' বলিতে হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, গর্জ্জনের মতো 'নির্ঘোষ' বলিয়া একটা ব্যাপার হইয়াছিল। আর একটা ব্যাপার আছে তাহাকে বলে 'কোলাহল'। কিন্তু কোলাহল একটা মিক্‌শ্চার, যেমন সোডাওয়াটারের সঙ্গে হুইস্কি। সকল জিনষেই নানাবিধ শব্দ আছে! সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা এক সময় গর্জ্জন দেখিয়াছি, নির্ঘোষও দেখিয়াছি। আপাততঃ তাহার ঝোঁক কল্লোলের দিকে। 'কোলাহল' অনিবার্য্য পদার্থ। যেমন সমালোচনা। অনিবার্য্য হইলেই তাহা পারিপার্শ্বিক ব্যাপার। সুতরাং অদৃষ্টচক্রের অন্তর্গত নির্ঘোষ, গর্জ্জন, কল্লোল, প্রভৃতি বিধাতার বিধানে নগরের মধ্যে একত্রিত হইয়া অপূর্ব্ব কোলাহলের সূত্রপাত করে। যদি কোন কবি সহরে জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁহার কাব্যে 'কোলাহলের' জন্য তিনি একবার নিশ্চয় দুঃখপ্রকাশ করিবেন। পল্লীর কোলাহল ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার বালকদিগের ধ্বনির ন্যায়। দদুর্‌রার সহিত ঝিল্লীর কনসার্ট!

যাহাই হউক, সকল বিষয় হইতেই আনন্দের ভাগটা টানিয়া বাহির করা যায়। যেমন ধ্রুপদ হইতে খেয়াল, খেয়াল হইতে টপ্পা, টপ্পা হইতে ঠুংরি। যেহেন সময় উপস্থিত, তাহাতে কেহ আনন্দ প্রকাশ করিলে অন্য কেহ চটিয়া উঠে, আর যদি নিরানন্দ প্রকাশ করে, তাহাতেও চটে। কিন্তু তাই বলিয়া কল্লোল রুদ্ধ করিয়া কোলাহলের পক্ষপাতী কেহই না। শৈশবের কল-কল ভাষ, যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ, ও বার্দ্ধক্যের অদন্তের হাসি, তিনটিতেই কল্লোল বর্ত্তমান। কল্লোলই আনন্দ, কল্লোলই মধুর। কোলাহলের উৎপত্তি মাথায়। কল্লোলের উৎপত্তি বুকে। মাথাটাকে যদি সহর বলিয়া ধরা যায় তবে কণ্ঠনালী হইতে বাকী মহাপ্রদেশটুকু একটা পল্লীগ্রাম। ইহাই পাঠ করিয়াছি ভূগোলে এবং দেখিয়াছি জীবদ্দশায়। তবে কি জানেন, কণ্ঠ এক-সেট্ মাত্র। সহরের ও পল্লীগ্রামের যত কোলাহল বাহির হয় তাহা একত্রে কণ্ঠ হইয়া। কিন্তু দেখুন বিধাতার কারুকার্য্য! যখন অন্নব্যঞ্জন কণ্ঠনালীর টনেল্ দিয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করে, তখন সহর পল্লী উভয়েই আনন্দাপ্লুত! অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ আছে এবং Vice Versa. ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। তখন কল্লোল উঠিতে থাকে হৃদয় হইতে, নচেৎ বাকিটুকু উত্থানশক্তিরহিত। আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয় পেন্‌সন লইবার পূর্ব্বেই উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়েন। তিনি বলেন, বিশ্ব জন্মিবার পূর্ব্বে নীহারিকা (Nebula) ছিল। মাথাটাও একটা 'নেবুলা' বিশেষ। বিশ্ব নিজেই যুগাবসানে উত্থানশক্তিরহিত হয়, মানুষ কোন্ ছার? কিন্তু কল্লোল ব'লে যে বিশ্বের হৃদয়পাখীর ন্যায় আনন্দে নৃত্য করে ত? উড়িয়াও বেড়ায়। সোর-

জগৎ মাধ্যাকর্ষনাকৃষ্ট হইলেও যতটুকু পারে উড়িতে থাকে। যাহাদের চিরদিন দুঃখেই গিয়াছে, আশার কুহকে তাহাদেরও হৃদয় সময় পাইলে নাচিয়া লয়। দুঃখের সময় সুর তান লয় সহকারে গান করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কল্লোল বলে অদৃষ্টের কথা পাড়' কেন ?

কবি বলেন, কেন "মেঘ আসে হৃদয়াকাশে—তোমারে হেরিতে দেয় না ?"

অদৃষ্টাচার্য্য ও বিজ্ঞানাচার্য্যের মধ্যে বাস্তবিক কোন মতভেদ নাই। হৃদাকাশে মেঘ আসে বলিয়া মানব কাঁদে। স্রোতস্বিনীর তট আছে, তাই ঘাত-প্রতিঘাতে কুলুকুলু ধ্বনি হয়। হৃদাকাশের মেঘ, তটিনীর তট, ইহারা পারিপার্শ্বিক ব্যাপার। খেলার সাথী। শৈশবের বন্ধু, যৌবনের প্রণয়িনী, বন উপবন, ঝড়, বৃষ্টি, অশনিপাত, রোগ শোক, পুত্র কলত্র যত কিছু আছে সংসারে তাহাদের ঘাত প্রতিঘাতে কর্ম্মজালের সৃষ্টি। সকলই অদৃষ্ট, কেবল পুরুষকারের মধ্যে আনন্দটুকু। 'বেঁচে বত্তো থাক্ আমি ত চল্লুম।' এটা বৃদ্ধের কল্লোল। সেও ভাবে যে সৃষ্টির মধ্যে তাহার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে।

(২)

সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ স্বভাবসিদ্ধ। আহারের সময় আমাদের বাটীর একটি পেন্সন প্রাপ্ত সুযোগ্য বিড়াল তাহার শাবককে লইয়া প্রত্যহ মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু হায়! সেদিন আর নাই! দুগ্ধ ও মৎস্য উভয়ই দুষ্প্রাপ্য। গৃহস্থ ও বিড়াল উভয়ই অসন্তুষ্ট। বিধাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলেই সমালোচনায় ব্যস্ত।

গৃহিণী। দুধ ও মাছ ত উঠে গেল, এখন উপায় কি ?

কর্ত্তা। এখন যা দাঁড়াবে তা 'মহামানব'। তারা দুধ, মাছ টাছ্, কিছুই খাবে না।

গৃহিণী। খাবে কি তবে ?

কর্ত্তা। সিগারেট ও চা।

গৃহিণী। তাহলে বাঁচ্‌বে কি ক'রে ?

কর্ত্তা। সে না বাঁচে তার বাপ্ ত বাঁচ্‌বে ?

গৃহিণী। বাপ আর কতদিন বাঁচ্‌বে ?

কর্ত্তা। এখন দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীলোক আর ছেলে পুলে চায় না। কাজেই সৃষ্টি রক্ষা ক'র্‌তে গেলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত যারা বর্ত্তমান, তারা চিরকাল বেঁচে থাক্‌বে। তাঁরা একবার ছেলে হবে, একবার বুড়ো হবে। এটা বিশ্বের অভ্যন্তরীন প্রণালীর নকল, অথচ প্রসবযন্ত্রণা নাই! সকল দেশের চেয়ে ভারত-মাতার যুগ-প্রসব-যন্ত্রণা বেশী। কারণ, শুকদেবের মতো, মহামানব শীঘ্র বেরুতে চায় না। কাজেই যারা আছে, তারাই ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে মহামানবের দশা পাবে। দরকার কি দুধ আর মাছের ? এই যে প্রণালী তাতে বিপ্লব প্রভৃতি নানা রকম প্রসব-যন্ত্রণার ইতিহাস থাক্‌বে না।

গৃহিণী। কিন্তু এই সব লোকের চরিত্র কি কখনো মহামানবের মতো হবে ?

কর্ত্তা। সেটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ, এই দুটোর মধ্যে একটার অন্তর্ধান হলে—চরিত্র ভাল না হয়েই যায় না। বার্নার্ড শ'র মতে পুরুষগুলোই দোষী, মেটের-লিংকী, ভ্লডিভষ্টক্ (?) প্রভৃতি বলেন যে, স্ত্রীলোকরাই দোষী। কিন্তু আজকালকার উপন্যাসবাদীরা বলেন যে, ছেলে পুলে না হ'লেও উভয় জীবেরই দরকার, নচেৎ 'প্রেম ব'লে' যে আনন্দের বস্তু তা থাক্‌বে না।

গৃহিণী। কিন্তু চরিত্রের পুরাণো কথা মনে পড়লে কি আর প্রেমের উদ্রেক্ হবে ?

কর্ত্তা। সেটুকু সময়ে জানা যাবে। আপাততঃ উভয় দল স্বাধীন হয়ে গেলে পুরুষকার ও অদৃষ্ট এক দাঁড়াবে। উভয়েই অনাদি সাংখ্যের মতে স্বাধীন।

গৃহিণী। যদি পুরুষরাই যায়, তবে কোথায় যাবে ?

কর্ত্তা। প্রলয়জলধিজলে ধৃতবানসি বেদং।

গৃহিণী। স্ত্রীলোক যদি যায় ?

কর্ত্তা। মহাপ্রস্থানের মত পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত দেহত্যাগ। হয়ত তার মধ্যে মহামানব যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাবেন। তারপরে ইতিহাস নীরব।

সুখ ও দুঃখ বাস্তবিক কি তাহা জানা ও না-জানা সমান। সুখ একদিক হইতে টানে, দুঃখ অন্য দিক

হইতে। সুখের টানে দুঃখ, ও দুঃখের টানে সুখ। তোমার সুখ অপরের দুঃখ, অপরের সুখ তোমার দুঃখ। যদি একজনের সুখে সকলের সুখ হয়, ও একজনের দুঃখে সকলের দুঃখ, সে রকম সাফল্য ও সাযুজ্য ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। আমরা ক্ষুদ্রজীব, অতি ক্ষোর পতঙ্গের মতন, আলোক দেখিলেই ছুটি, কিংবা কল্লোল শুনিলেই কান পাতিয়া দিই। অংশুল পদার্থের মধ্যে দেখিয়াছি দুঃখক্লিষ্ট অথচ হাসিভরা মুখ। কল্লোলের মধ্যে শুনিয়াছি জননীর স্নেহবাণী, বন্ধুর আনন্দ উচ্ছ্বাস। হয়ত অনেক মহাজন অনেক রকম দেখিয়াছেন। উপন্যাসে, কাব্যে চিত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহাদের খণ্ড সমালোচনা মাসিকপত্রেও বাহির হয়। তারই মধ্যে কল্লোল মাঝে মাঝে হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া বাউলের সুরে জীবনের সার কথা গাহিয়া চলিয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বীরবলের খাঁটি কথা আমাদের মনে লাগে,—জগতে নূতন কথা কিছুই নাই, কেবল বলিবার ঢংই নূতন। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু কল্লোলের ঢং আমাদের অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী।

(৩)

অতঃপর ঢং-এর কথা বলি। অবধান করুন। Communism একটা ঢং। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতার মেসে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হই, তখনও মেসের যে ঢং (style) ছিল, এখনও তাই আছে। প্রত্যেক মেস্ এক একটা Commune-এর সদৃশ। প্রথমতঃ, স্ত্রীলোকের জঞ্জাল নাই। দ্বিতীয়তঃ, Dyarchy নাই। তৃতীয়তঃ বাণিজ্য ব্যবসার স্বার্থ নাই। চতুর্থতঃ, অন্ন বস্ত্রের অভাব সকলেরই সমান। সমান রে ভাই! কারণ?—কারণ, ধনীপুত্রে মেসের মধ্যে জুটে না। মেস্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। গুরু পরস্পরের সকলেই। কাজেই কল্লোলের আবির্ভাব! সেকালে দর ছিল সস্তা। পাঁচ টাকা per head, per mensem! মোটা চাউল, আলুভাতে, সজিনার খাঁড়ার চচ্চড়ি, বাদাচিংড়ীর ঈষৎ সুবর্ণাভ ঝোল, তদ্য সহিত সোনামুগের দাইল, ও জলবৎ তরলং দুগ্ধ। সকলিই Vitamine পূর্ণ। সেটা সিক্তি হইত হৃদয় হইতে। মনে পড়ে একদিন ম্যানেজার দক্ষবাবু একমাস অবসর গ্রহণান্তর বিবাহ-কর্ম্ম স্বদেশে সমাধা করিয়া মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা একলম্ফে একজোট হইয়া গাহিতে সুরু করিলাম—"তুই কি ঘরে এলিরে রামধন"? (আলেয়ার সুরে) রামধনের প্রবেশ—এক হাঁড়ি আসল ভীমনাগের সন্দেশ লইয়া! সে বেচারা সারা রাস্তা অনাহারে ছিল, একটা সন্দেশও স্পর্শ করে নাই। কারণ, মেসের মেম্বর বাইশটি, সন্দেশ অষ্টাশী। সে কি করিয়া চারিটী সকলকে বাঁটিয়া দিবে, তাহারি ধ্যানে প্রাণান্ত। আমরা আনন্দাশ্রু-পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। নববধূ বলিয়া দিয়াছিল, 'তোমার বন্ধুদের আগে দিও, রাস্তায় গোগ্রাস ক'রো না।' যেমন দক্ষ, তেমনি তাহার নববধূ! ভারত-বর্ষের বধূ। ভারত সন্তানের জননী! বাঁচিয়া থাক জননী! তোমারই ঔরসে যেন অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হয়!

বস্ত্রের বেলাও তাই। নবগোপালের ছিল একজোড়া কালপেড়ে ফরাসডাঙ্গা। কৃষ্ণপক্ষ না কাটিলে রজকের আবির্ভাব হইত না। সুতরাং শুক্লপক্ষে পোষাকীবস্ত্রের অনটন হইলে নবগোপালের কালপেড়ে ধুতি ছাড়া আমাদের অন্য উপায় ছিল না। জার্ণবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মেসের ভাণ্ডারী ভূতনাথ!

মেসের Psychology ছিল অদ্ভুত! মানবের পূর্ব্ব সংস্কার মজ্জাগত থাকে, তাহার নিরোধ দীর্ঘনিশ্বাসে। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল)। একটু বায়ুপ্রধান, Ignatia তাহার ঔষধ। যাহাদের বাল্যবিবাহ হয় নাই তাহারও দীর্ঘনিশ্বাস, যাহার হইয়াছে তাহারও দীর্ঘনিশ্বাস! পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিবেকবাণী গভীর জল হইতে কাতলা-মৎস্যের 'ফুটের' মতো উর্দ্ধে উঠে। কাহারও সনাতন ধর্ম্ম লঙ্ঘনের ভয়, কাহারও সনাতন অধর্ম্মলঙ্ঘনের ভয়। সমাজের জন্ম ভয়, বিধবাবিবাহের জন্ম ভয়, স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্ম ভয়, স্বদেশহিতৈষিতার জন্য ভয়, পুলিশের ভয়, দোকান-দারের দেনার জন্য ভয়! সেই বিভীষিকা জালের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। ম্যানেজার বলিত, "ওসব কথায় মাথা ঘামিয়ে

মরিস্ কেন ? বেশী বৃষ্টি হ'লেও চাষার ভয়, অনাবৃষ্টি হ'লেও ভয়। উপায় কি ? হেসে-খেলে ম'রে যা'।

মানুষ যদি ঈশ্বরের রূপ হয়, তবে সেই অসংখ্য ঈশ্বরের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে একটা Social Contract আছে নিশ্চয়, সেই চুক্তির নাম সহ্যগুণ। আমাদের মেসে ছিল কেদারনাথ। ঈষৎ স্থূলকায় ও নাক্ চ্যাপ্‌টা। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উদীয়মান্। কেদারনাথের মেজাজ শেলিব মতো। সে বিশ্বকবির ঢংটা নকল করিতে চেষ্টা করিত। তাহা দীর্ঘকেশে। আমরা বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিতাম, কিন্তু তাহার সহ্যগুণ ছিল অসহ্য ও অসীম। অসীম আমাদেব পক্ষে অসহ্য। শীত গ্রীষ্মের ত কথাই নাই, অসীম ভালবাসাও অসহ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সসীমের মধ্যে অসীমকে বদ্ধ করিয়া আমরা ছিলাম আলীপুরের পশুশালার মতো। একটা উল্লূক ডাকিলে আফ্রিকার গণ্ডার, ব্রহ্মদেশের হস্তী, সুন্দর বনের বাঘ, দাক্ষিণাত্যের নীলগাই, বাংলার পাপিয়া, কাশ্মীরের ছাগল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ষণ্ড, ও কাঞ্চীদেশের কপোত—সকলেই একতানে ডাকিয়া উঠিত। সেটা কোলাহল, না কনসার্ট ? কেহ চিৎপাৎ হইয়া, কেহ চেয়ারে বসিয়া, কেহ সিঁড়ির ধারে, কেহ রন্ধনশালায়, কেহ সংবাদপত্র হাতে, কেহ স্নানের টবের পার্শ্বে, কেহ বা Cobra Polish লইয়া বাদামি জুতার চাকচিক্যসাধন তৎপর। পাপ-পুণ্যের ধারণাহীন, ভবিষ্যতের চিন্তাহীন, অতীতের স্মৃতিহীন, সেই সোনার মুখ সকল কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে বলিতে পার ? যাহাদের অন্নগত, শয্যাগত ও কামদেহগত চৈতন্য তাহাদের জিজ্ঞাসা করা বৃথা। যাহাদের subconscious state হইতে বিশ্বচৈতন্যের কল্লোল উত্থিত হয়, তাহারাই মানব বিরহ ও ঈশ্বরবিরহের কথা বলিতে পারেন। ধন্য তাঁহারা।

(৪)

কল্লোল কখনও পল্লীতে যায়, কখনও সহরে থাকে। সহর ও পল্লী পরস্পরকে দেখে, যেমন দেখে দুইটি ভাঙ্গা-মন্দিরের দেউল পরস্পরকে। সহরের শোভা পল্লীতে নাই, পল্লীর শোভা সহরে নাই। অতএব আর্টের হিসাবে উভয় উভয়ের complementary, কিন্তু Science-এর হিসাবে পল্লীগ্রাম হইতে সহর অগ্রসর। পল্লীগ্রামের drainage বাহিরে মুক্ত, অভ্যন্তরে বদ্ধ। সহরের drainage বাহিরে বদ্ধ, অভ্যন্তরে মুক্ত। সুতরাং ব্যাধি সম্বন্ধে একটু ইতর বিশেষ। পল্লীসংস্কারের জন্য সহর ব্যস্ত ও সহর সংস্কারের জন্য পল্লীব্যস্ত। সহর বলে, 'চাষ কর, গোজাতির উন্নতি কর, চর্খা কাট', জলগরম, ও ফিলটার করিয়া পানকর, জমিদারের খাজনা বন্ধ করিয়া দেও, জঙ্গল কাট, মশা মার, দলাদলি ভাঙ্গ, পতিতা নারীকে সমাজে স্থান দেও ইত্যাদি। পল্লী বলে, তোমরা যে রসায়ন ও বাজীকরণে মত্ত, আমরা তা কর্‌ব না কেন ? আমরা মোটরে চড়ব, openbreast ব্যবহার করব, নূতন সহরের পত্তন কর্‌ব, কল কারখানা পল্লীতেই খুল্‌ব, একবার রপ্তানীটা বন্ধ করলে হয়, তখন সব ভায়া কল-কব্জা-স্ক্রুপ নিয়ে পল্লীতে দৌড়ুবেন। সহর বলে, ওলো পল্লী ! তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ! তোর জল একেবারে পচা পূতিগন্ধময়, তারই জন্য ম্যালেরিয়া। তোর আঁতুড় ঘর হতেই শিশুর অকালমৃত্যু, তোর গুরুমশায় অকালকুষ্মাণ্ড। পল্লী বলে, তোর মুখে ছাই। সাবান ঘস্‌লেই কি ফর্সা হয়, তোর পচা হাসের ডিমের অম্বলের ব্যারাম যাবে কোথা। তোর ফ্যাসন দেখে গা ন্যাকার করে। আমাদের বাছা বাছা নিয়ে ছেলেপুলে, বানর, গরু, মহিষ, তোরা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্, আমরা কেবল কুইনাইন খাব, আর তোরা মাসিকপত্রে ও উপন্যাসে আমাদের চতুর্দ্দশপুরুষের শ্রাদ্ধ করবি, এ রকম চলবে কত দিন ?

কল্লোল বলে, হে শুক ও সারী ! তোমাদের ঝগড়া থামাও। কোলাহল আমি ভালবাসি না। পরস্পরের দরদী হও।

পল্লীর ভাঙ্গাপাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া যাহারা সহরে আসিয়াছিল, কিংবা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল, তাহারাই ভারতবর্ষের মহামানব। পল্লীর দৃষ্টি অন্তরের দিকে। সহরের দৃষ্টি বাহ্যে। কল্লোলের দৃষ্টি পল্লী ও সহরের আত্মার দিকে। মেসের Commune-এর মধ্যে পল্লীর

ও সহরের আত্মা সমবেত হইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার পল্লীতে ভাঙ্গিয়া মহানগরীর তটে আসিয়া লাগিয়াছে, যথা একদা শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য নৌকা সিংহলে লাগিয়াছিল। পথিমধ্যে কমলে কামিনী দর্শন। কল্লোল পল্লীর ও সহরের রক্ত একত্র করিয়া গলায় রাখে। তার মধ্যে আছে কি?—

কঙ্কালের হাসি

কল্লোলকে আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হইয়া থাকুক।

আমি-হারা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আর কিছু চাহে নাই; চেয়েছিল শুধু সঙ্গে যেতে,
পথের কলঙ্ক যত নিয়েছিল নিজ অঙ্গে পেতে;—
তবু লই নাই সাথে!
প্রমত্ত সে জয়যাত্রা দিনে
কে বহে পথের বোঝা, কে চাহে নগণ্য বলহীনে!
যশের দুর্গম দুর্গে যাত্রা মোর নিঃসঙ্গ একাকী—
দুর্জ্জয় লক্ষ্মীরে জিনি নিজহস্তে পরাইব রাখী,

সরনী হয়েছে শেষ; মন্দাক্রান্তা জীবনতরণী
চলেছে ভাটার মুখে সন্ধ্যাঘোরে তিমিরবরণী;
লাগিছে পারের হাওয়া জাগাইয়া শীতশিহরন;
অজানা সে বৈতরনী সর্ব্বশক্তি করিছে হরণ।
যতদূর চক্ষু যায়, কেহ নাই, কোথা নাই কেহ,
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার নিজদেহে ঘটায় সন্দেহ!
সহসা পারের বাঁকে কে গো দাঁড়ায়ে সুন্দরি!
সেই সকরুণ আঁখি, চেয়ে দেখি, অশ্রুবারি ভরি'
সাজায়ে মঙ্গলঘট অভাগার অমঙ্গল দিনে,
নিরাশের খেয়াঘাটে দুরাশার পথচিহ্ন চিনে!
যত দিন ছিনু আমি, ততদিন চাহি নি ও মুখে,
আমি-হারা অন্ধকারে আজি তুমি হাসিছ সম্মুখে!

পুরাতনী

[১২৯৫ সালে বাংলা মাসিক পত্রিকাদিতে যে রূপ ভাবে মাসিক সংবাদ প্রকাশিত হইত বর্ত্তমান সময়ের পাঠকদের জন্ত আমরা তাহার কিছু সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

কল্লোল সম্পাদক]

মাসিক সম্বাদ

'প্রচার' পত্রিকা, ভাদ্র হইতে আশ্বিন, ১২৯৫ সাল

এবারকার মাসিক সম্বাদ খুব জাঁকাল সম্বাদ। প্রথম নম্বরের সম্বাদ, তিব্বতে খুব যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। তিব্বতীয়েরা হারিয়া গিয়াছে—ইংরেজের কাছে কে না হারে? জেনেরল গ্রেহামের আক্রমণে তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। চারিশত তিব্বতীয় যোদ্ধা যমপুরে গিয়া ব্রিটিশ্ বাহুবলের পরিচয় দিতেছে। তারপর জেনেরল গ্রেহাম দুর্বৃত্তদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চুম্বি অধিত্যকা আক্রমণ করিয়াছেন। জলাপা পাস্ অধিকৃত হইয়াছে; সিকিমের রাজা, যাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে সরকার বাহাদুর এই যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ নাই। রাজাটি অতিশয় নির্ব্বোধ সন্দেহ নাই, তা নহিলে মিত্রের ভয়ে পলাইবে কেন? আর যেমন তেমন মিত্র নহে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মিত্র। নদী কি নদীপতি সাগরকে ভয় করে? বরং নদী সাগরাভিমুখে গমন করিয়াই থাকে।

তা যাক তিব্বতীয়েরা পলাইতেছে, ব্রিটিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, পিছু পিছু যাইতে হইবে কতদূর? বেড়াইতে বেড়াইতে লাসা পর্য্যন্ত না কি? ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা আর পাথেয় যোগাইতে পারি না। তাহার উপায় করা যায় না কি? খাঁদা নাকের উপর একটা টেক্স বসে নাকি?

*

* *

সম্বাদ নম্বর দুই, কাবুলের আমীর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ইশাক খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছেন। আমীরের সময় বড় ভাল নহে। কথাটা উঠিয়াছে, যদি আমীর হারেন, তবে কাবুল নামক রুটিখানাকে দুইটি টুকরা করিয়া এক টুকরা সিংহ, এক টুকরা ভল্লুক মহাশয় উদরসাৎ করিবেন। ইহা না করিলে না কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবে না। ভাল, তাহা না হয় করিলেন। কিন্তু জীর্ণ করিবার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অনেক রাশি রূপার চাকতি নহিলে রাজার উদরে একটা রাজ্য জীর্ণ হয় না। তার ভার আমাদের উপর। তারপর আবার শুনিয়াছি, 'কালো পাহাড়ে' কোন চুয়াড় জাতি আছে, ইংরেজকে তাদের সঙ্গে ভারি লড়াই লড়িতে হইবে। আমাদিগকে টাকা যোগাইতে হইবে। আমাদের ধনবল নহিলে ইংরেজের বাহুবলে কিছুই হয় না। তোমরা ইংরেজের বাহুবলের প্রশংসা কর। কিন্তু আমরা আমাদিগের ধনবলের প্রশংসা করি। ব্রহ্ম বল, কাবুল বল, তিব্বত বল, আমাদের ধনবল নহিলে জিত হয় নাই। আমরা বড় ধনবান্। তোমরা একবার আমাদের ধনের প্রশংসা কর।

*

* *

ব্রহ্মে বিদ্রোহানল; তিব্বতে যুদ্ধানল; কাবুলে রুষানল, ঘুষানল, এবং হিন্দুকুশানল। চারিদিকে আগুন দেখিয়া আমাদের চির হিতাকাঙ্ক্ষী দেবেন্দ্র বন্যায় বাঙ্গালা দেশ ভাসাইয়া দিয়াছেন। দেবতার এটুকু দয়া বটে। অন্ততঃ আমরা জলে ডুবিয়া মরিতে পারিব। কোন কোন স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারেন বটে যে, ইহাতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য যে, সময় থাকিতে

থাকিতে, বিল খাল পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতে, কাজ নিকাশ করিয়া রাখিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। আমাদের বিবেচনায় এই বেলা ঘটি বাটি টেক্সের বাবুকে বুজ সমুজ করিয়া দিয়া কেবল কলসীটা লইয়া জলে নামিলেই বাঙ্গালি জন্মের সকল জ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে।

*

* *

এই গণ্ডগোলের সময়ে আবার পাষাণের মেয়ে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। মহিষাসুরও নই বৃষাসুরও নই, কোন প্রকার অসুর বা সুর নই, আমাদের বুকে বর্শা কেন মা? কি অবিচার মা; রাজা পা-খানা সিঙ্গী ভায়ার ঘাড়ে—আর আমাদের বেলা কেউটে সাপ আর তীক্ষ্ণ বর্শা? দেড় পয়সা করিয়া বেগুণটা, বার পয়সা আলুর সের, এই কি অন্নপূর্ণার আগমনের লক্ষণ? এবার তোমাকে দেশের অন্নের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, নহিলে অনেকে পরামর্শ করিয়াছে, বিজয়ার দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। দুই দিন অগ্র পশ্চাতে তাদের কি আসিয়া যায়?

*

* *

এই অসময়ে রসময় খাঁ সাহেবেরা কংগ্রেস লইয়া রঙ্গরস বাঁধাইয়াছেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদ্ঘোষণ উপলক্ষে শ্বেতকৃষ্ণহরিৎকপিশ প্রভৃতি নানা বর্ণের দাড়ি একত্রিত হইয়া বহুধা আন্দোলিত ও নিষ্ঠীবনকণানিচয় বিভূষিত হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন, অছিন্ন এবং বিছিন্ন শ্মশ্রুরাজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ, আবেগ, সম্বেগ, ও উদ্বেগ সন্দর্শনে ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। * * *

সৌভাগ্যক্রমে সকল মুসলমান এইরূপ দুরবস্থাপন্ন নহেন। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধির ধার ধারেন, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে।

*

* *

এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি; সে গুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে না কি কল টিপিতেছে, তাই ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন, কলের পুতুল, কলে দাড়ি নাড়িবে, তাহাতে আর আপত্তি কি?

*

* *

রসের কথা এই যে, গোটা কত হিন্দু টিকি মুসলমানের দাড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কাশীর রাজা, ডিঙ্গার রাজা, রাজা শিবপ্রাদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। কলে শুধু দাড়ি নয়, টিকিও নড়ে। যে তিনটি নাম করিলাম তিনটিই রাজা। লোকের মনে থাকে যেন, রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়।

*

* *

আমরা একটা অতি আবশ্যক সংবাদ দিব। বিলাত হইতে এদেশে জিনিস আসিলে তার একটা আমদানী শুল্ক দিতে হয়। মাঞ্চেষ্টরের তাঁতি গায়ের জোরে শুল্কের হাত এড়াইয়াছে, আর এড়াইলেন উনীশতোপী রাজগণ, বিলাত হইতে অতঃপর ইঁহাদের কোন দ্রব্যাদি আসিলে তাহার না কি আর মাসুল লাগিবে না। একুশতোপীদের বেলায় মালের সঙ্গে কিছু কিছু দর্জ্জিরও পঁহুছিলে ভাল হয় না?

আগামী কাল

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অক্টোপাসের মত সহর তার শুঁড় বাড়িয়েছে চারি ধারে—

শ্যামল মৃত্তিকা থেকে শুষে নেয়—সমস্ত শাঁস ও শস্য—তাজা মানুষের রক্ত ও প্রাণ—আত্মাও—

কিন্তু শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয় এদিকটা যেন অন্য রকম দেখায়। মনে হয় ও যেন রাস্তা নয়; ও যেন অন্ধ শ্রান্ত কাতর কোন অবরুদ্ধ প্রাণের ব্যাকুল সব বাহু অনিশ্চিত সুদূরের দিকে প্রসারিত হ'য়ে আছে।

হয় ত এও তার আর একটা রূপ!

কে জানে!

দিনের বেলায় ইঞ্জিনিয়ারের গজ ফিতে, রোলার, কণ্ট্রাক্টারের হিসেব আর কুলির গাঁইতি, আর রাত্রে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয় তার পঙ্গু আত্মার এই কাকুতি!

হয় ত দুইই সত্য।

সহর সাবালক হচ্ছে। কার গেল ফলের বাগান, কার গেল ফসলের ক্ষেত, গোল পাতার গাঁ উঠ্‌ল—পুকুর দীঘি ভরাট হ'ল, তাল নারকেল খেজুরের মাথা নুইল—সহর এগিয়ে চলেছে।

সমস্ত সমতল করে খোয়া মাড়িয়ে বড় বড় নতুন সড়ক চলেছে মাটিকে ভাগ ক'রে ক'রে।

সহরের বড় বড় ব্যবসাগুলো বুঝি ফেঁপে উঠেছে। দুশ নতুন চিমনি উঠেছে আকাশের মুখে কালি মাখাতে। খাজাঞ্চিখানার কেরাণীদের আর কলমের কামাই নেই; বড় নদীটার জেঠিতে জেঠিতে জাহাজে জাহাজে জাঁতাজাঁতি...

—ধান আর পাট বুঝি, গালা আব তুলো, চামড়া... বাজার এমন চড়া কেউ—দেখেনি কখন। বানের নদীর মত সহর সব সীমা ভেঙে বেড়ে চলেছে।—ধরণীর গায়ে দূষিত বিস্ফোটকের মত কি?

রাত্রে কিন্তু এদিকের অর্দ্ধসমাপ্ত পথগুলি যেন মনে হয় রূপকথার দেশের পথিক।

বসতিবিরল বিস্তীর্ণ প্রান্তর আপনার বিপুল নিস্তব্ধতায় থম্‌থম করে, পথ আগলে রক্ত চক্ষু বাতিগুলি পাহারা দেয়, অসম্পূর্ণ পথের ঘাটিতে ঘাটিতে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের পোষ্টগুলি সৈন্যশ্রেণীর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় মানুষের দম্ভ যেন মানুষের স্বপ্নের সাথে সন্ধি করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে!

লোকটার সমস্ত মুখ দিয়ে যেন খোসা উঠছে,—শুকনো, ফাটা, নীরস। রুক্ষ চুলগুলো মাথার উপর ঝাঁকড়া হ'য়ে আছে, ময়লা, নোংরা কাপড়টা মালকোচা মেরে পরা, তার ওপর খাকি রঙের ছেঁড়া দাগী কোটটা গায়ে ঢল্‌ ঢল্‌ করে।

অদ্ভুত কায়দায় দুটো টিনের পাত হাতে কাঁচির মত বাগিয়ে ধরে পান কাট্‌তে কাট্‌তে শিবু বলে, "এখন বিঘের দরে কাঠা বিকোয়, রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত বাড়ী গজাচ্ছে, সেদিন আর আছে..."

ঠোঁটের এক কোণে বিড়িটা চেপে ধরে, হাতের চেটোর আড়ালে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে লোকটা ঠোঁটের অন্য কোণ দিয়ে বলে, "হু!"

চুণ খয়েরের কাঠিটা বুলিয়ে সুপুরি এলাচ মশলা দিয়ে ক্ষীপ্র হাতে শিবু পান মোড়ে।

তিন বছর আগেও এই কলাবাগানে দিন দুপুরে ডাকাতি হয়ে গেছে।"

শুকনো লোকটা এক সঙ্গে সব কটা পান মুখে পুরে দেয়; ডান গালের খোদলটা ঢিপির মত উঁচু হয়ে ওঠে। পকেট থেকে আধ-ময়লা একটা রুমাল বার করে মাথায় বেঁধে বলে, "যা—রোদ্দুর!"

শিবু কথা কয় না, বিজ্ঞের মত একটু হাসে।

লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, "এই সোজা গেলেই বিপিনবাবুর বাড়ী পাব ত?"

"হ্যাঁ।"

খোসা ওঠা লোকটা ছ্যাকড়া গাড়ীর মত ঢিকোতে ঢিকোতে চলে যায়।

—রাস্তার দুটো ফ্যাকড়া চিমটের ফলার মত দুধারে বেরিয়ে গেছে। তারি মোড়ে কেরাসিন কাঠের ছোট পানের দোকানটি—সহরের অগ্রদূত।

সামনে রঙিন জলভরা দুটি কাঁচের বোতল ঝোলে। ভেতরে গা-ময় হরেকরকমের ছবি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন, দেশলাইর ট্রেডমার্ক থেকে কাপড়ের ছবি পর্য্যন্ত।

বিঁড়ি আছে, সস্তা সিগারেট, দেশলাই, মোমবাতি, মায় কাশীর জরদা।

ইটের দেয়াল আর করোগেটের চাল—ছোট্ট বাড়ীটি। সামনে ব্যাকারিড় বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটু বাগান।

খোসা ওঠা লোকটা গিয়ে ডাকে, "বিপিনবাবু—" স্বয়ং বিপিন বাবুই বোধ হয় খিল খুলে বাইরে বার হন। ছোট্ট আঁটালো গোলগাল মানুষটি, টাকপড়া মাথাটি বেলের মত চাঁছা ছোলা, পরিষ্কার। পরনের ছ'হাতি ধুতিটি হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগোয় নি। কপালে হাত ঢাকা দিয়ে রোদ বাঁচিয়ে ছোট ছোট চোখ দুটি মিট্ মিট্ করে বল্লেন, "কে?"

"আমি বিলাস!"

ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় বিপিনবাবুর মুখের ওপর দিয়ে একটি ছায়া সরে যায়, বলেন, "এসো"।

বিলাস গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করা অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরটিতে ঢোকে।

"বস।"

বিলাস ঘরযোড়া তক্তপোষটির একপাশে বসে। তক্তোপোষের একমাথায় বিছানাটি গুটিয়ে রাখা। বিছানায় হেলান দিয়ে আলবোলার নলটি তুলে নিয়ে বিপিনবাবু বলেন, "তারপর—!"

তারপর চুপচাপ! কেউ কথা পাড়ে না। ব্যাপারটা কি? বিপিনবাবু দুবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলেন, "তারপর"—তবু কেও কথা কয় না। দরজার একটা ছিদ্র দিয়ে সড়কির মত সরু একটি রোদের রেখা এসে ঘরে পড়েছে। তামাকের ধোঁয়া সেই রেখাটি জুড়ে নীল হ'য়ে গুলোয়।

হঠাৎ বিলাস ঘুরে ব'সে বলে, "তারপর?—তারপর এ। ঘাবড়াচ্ছ কেন?"

"কে—আমি? বাঃ—বাঃ আমি ঘাবড়াব কেন?" —বিপিনবাবু একেবারে উঠে বসেন।

বিলাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসে মাত্র। চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে বলে, "বেশ গুছিয়ে বসেছ দেখ্‌ছি যে!" অপর পক্ষকে নিরুত্তর দেখে খানিক বাদে আবার বলে, "ভোলও দিব্যি ফিরিয়েছ! টাকটি বাগালে কোথায়?"

আলবোলার নলটা নামিয়ে রেখে বিপিনবাবু বলেন, "আমি তোমার কথার মানে কিছু বুঝ্‌তে পারছি না বিলাস!"

বাঁ চোখের ভুরুটা কপালে তুলে ঠোঁটের দুধার একটু কুঁচ্‌কে বিপিন বলে, "তার আর আশ্চর্য্য কি! অনেক দিন বাদে পুরাতন সখাকে দেখে আনন্দে একটু গদগদ হয়ে পড়েছ আর কি!"

"না, ঠাট্টা নয়।"

"ঠাট্টা! ঠাট্টা কে করছে! বন্ধুকে দেখে বন্ধু আহ্লাদে আটখানা হবে—এটা ঠাট্টার কথা নাকি?"

বিপিনবাবু জোরে জোরে হাসেন। "একেবারে ঠিক সেই রকমটি আছ বিলাস!"

"হ্যাঁ দাদা, বদলাবার ফুরসুত পাই নি। এখনও পেটের ধান্দায় দিনরাত ঘুরতে হয়। কিন্তু দাদ', তুমি বদলেছ! ছ বছরের মধ্যে মাথাটিকে দিব্যি মোলায়েম মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছ, পৈতৃক নামটাও পাল্টেছ। দেহে কিঞ্চিৎ মাংস ও মেদেরও সঞ্চার হয়েছে। তারপর কলাবাগানের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বিপিনবাবু কি রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট পেন্সনার, না—পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া বিতাড়িত জমিদার?"

বিপিনবাবু মুখ চোখ লাল করে বলেন, "দেখ বিলাস, আমারই বাড়ীতে বসে আমায় অপমান করতে তোমায় আমি দেব না!"

"রামঃ—তা কখন কেউ দেয়—; কিন্তু বুঝতেই ত পারছ দাদা, বাজার মন্দা, খবরের কাগজ ফিরি করে দিন গুজরান হয়; তোমার আজকাল সময় ভাল, ভাবলাম একটা বড় খদ্দের হলেও হতে পার!"

বিপিনবাবু বোধ হয়—কথাটা ভাল করে বোঝেন না, নির্বোধের মত সামনের দিকে চেয়ে থাকেন। বিলাস জামার বিশাল গহ্বরের মত পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে সসম্মানে তার হাতে দেয়।

পুরাণ খবরের কাগজ। অনেকবার মুড়ে মুড়ে বোঝা যায় ভাঁজগুলো ছিঁড়ে পড়পড় হয়েছে।

বিপিনবাবু খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে খানিকটা বিমূঢ় হয়েই থাকেন। তার পর হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে, খানিকটা লেখা লাল কালির দাগে ঘেরা।

বিলাস পানে ছোপান দাঁত বার করে ঈষৎ হাসে।

বিপিনবাবু পড়েন।

পড়া শেষ হতে না হতে বিলাস হঠাৎ কাগজটা টেনে নেয় হাত থেকে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, "কাগজের দামটা আগে ফেলে দিলে ভাল হত না কি?"

বিপিনবাবু ক্ষিপ্তের মত লাফিয়ে ওঠেন, "অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু বিলাস!"

কিন্তু বিলাস তক্তপোষ থেকে নেমে, কাগজটি ডান হাতে পেছনে লুকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"মাফ্ করতে হবে দাদা! দামটা না পেয়ে কাগজটা কেমন করে দিই?"

বিপিনবাবু রুদ্ধ ক্রোধে উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই বলেন, "দাম আমি দেবো।"

"বহুৎ আচ্ছা!"—বিলাস কাগজখানা এগিয়ে দেয়।

বিপিনবাবু পড়া শেষ করে বিলাসের দিকে চেয়ে এবার হাসেন, "তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও বিলাস?"

বিলাস কথার উত্তর দেয় না, গম্ভীর স্বরে বলে, "কাগজের দামটা?"

রাগে তক্তপোষে সজোরে চাপড় মেড়ে বিপিনবাবু বলেন, "তোমার থিয়েটারী ঢং রাখো, তোমার কাগজের দামের চার পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি!"

"দশহাজারের একটি আধলা কম নয়।"

এবার বিপিনবাবু হো হো করে হাসেন, "তুমি সত্যি পাগল হয়েছ বিলাস!"

বিলাস তেমান থিয়েটারী ঢঙে কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে যায়, "শুধু দশ হাজার নয়! তোমার বাড়িতে ছুটি বছরের দানাপানি আর আস্তানা।"

"একটি কাণা কড়িও তাহলে নয়! ভয় আমার একলার নয় বিলাস, সেটা তুমি বোধ হয় সহজে ভুলে যাচ্ছ! ডুবতে হলে তোমায় না জড়িয়ে আমি ডুবব না।"

বিলাস তেমনি সহজ কণ্ঠে বলে যায়, 'ভয় আমারো আছে এই কি দাদা। হ্যাংটার যেমন বাটপাড়ের ভয়! ছবছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছি তোমায় খোঁজে, বড়লোকের গাড়ী-বারান্দায় শুয়ে আর চানা চিবিয়ে দিন কাট্‌ছে; ভয় আমার নয়?"

ভিতর দিকের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা যায়। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে বলে, "বাবা, তোমার কলকে বদলে দেব?"

সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে অত্যন্ত ক্রূর মুখভঙ্গী করে বিলাস বলে, "ভয় দুজনেরই, কেমন বিপিন? কিন্তু আমি ডুবলে—" বিলাস আর কিছু বলে না। থোস্না ওঠা মুখটা নির্ম্মম হাস্যে অত্যন্ত বীভৎস দেখায়।

সহর বাড়ে।

কেন?

আমেরিকার উপর দিয়ে বুঝি আগুনের হল্কা গেছে। কানাডা থেকে সারা আমেরিকায় অজন্মা।

মধ্যোপসাগরের পশ্চিম দরজায় ইউরোপের ক'টা মাথা বুঝি ঠোকাঠুকি করে মরছে। কোন্ বৈজ্ঞানিকের তপস্যায় বুঝি কাঁচ তার ভঙ্গুরত্ব ত্যাগ করেও খোলামকুচির মত সস্তা হয়েছে। তাই সহরের চিম্নিগুলো আকাশের দিকে ফণা তুলে উঠ্‌ছে, তাই তার এই বাড়।

হারিকেনের কাঁচের চিমনির ভেতরেও আলোর শিখাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, চিমনিতে শিষ উঠে কালি পড়ে।

দক্ষিণের হাওয়ার ত আর আটক নেই। বাধাহীন প্রান্তরের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়।

"জানলাটা বন্ধ করে দেব বাবা? এত হাওয়া, নইলে বাতিতে শিষ উঠবে আরো।"

বিলাস গলার স্বর মিষ্ট করে বলে, "দাও ত মা!"

লীলা ভ্রূকুটি করে একটু। জানলাটা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিলাস বলে, "আমাকে বিশ্বাস করতে তোমায় বলি না, কিন্তু আমার বুদ্ধিতে বিশ্বাস রেখে কখনো ঠকেছ?"

"না, আমার সাহস হয় না"—বিপিনবাবু হাতের ওপর মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিলাস হঠাৎ উঠে দক্ষিণের জানলাটা আবার খুলে দেয়। কাঁচের চিমনির ভেতর আলোর শিখা হাওয়ার দমকে অকস্মাৎ যেন চমকে লাফিয়ে ওঠে।

"আবার খুল্‌লে কেন?"

সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিলাস বলে, "দক্ষিণের এই মাঠটা কার, জান?"

"পালেদের!"

"এই সমস্ত মাঠটা কিন্‌তে হবে।"

বিপিনবাবু হেসে বলেন, "একশ বিঘে পোড়ো জমি ইটখোলা করতে গিয়ে লোকসান দিয়ে পালেরা ফেলে রেখেছে—একটা পয়সা হয় না ওথেকে। তুমি ক্ষেপেছ!"

"আবার ইটখোলা হবে;—তা ছাড়া আরো কাজ আছে।"

"তোমার মাথা আছে! অন্ততঃ পঁচিশ হাজারের কমে তারা ছাড়বে না—আমার অত টাকা নেই, আর থাকলেও আমি পাগল হই নি।"

"আমার দশ হাজার আর তুমি ত্রিশ হাজার দাও—বারো আনা চার আনা বখরা; মনে রেখো আমার মাথাটা ফাউ।"

বিপিনবাবু রেগে ওঠেন, "চুলোয় যাক তোমার মাথা। আমার কাছ থেকে আর একটি কাণাকড়ি তুমি বার করতে পারবে না। গলায় ছুরি দিলেও নয়।"

"কিন্তু টাকা যে চাই-ই আমার।"

বিপিনবাবু উত্তেজনায় উঠে বলেন, "তুমি কি এখনো এমনি করে জুলুম করবে বিলাস! তোমার কথামত সমস্তই হ'ল, তবু কি তুমি আমায় পথে বসাতে চাও—একটু মায়া দয়া নেই তোমার!"

"ছ বছর আগে আমায় পথে বসিয়ে সরে পড়বার সময় কতখানি মায়া দয়া দেখিয়েছিলে ভাই?—কিন্তু সে কথা নয়; এতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।"

"আর মন্দ হ'লে লীলার কথাটা একবার ভেবে দেখেছ?"

'দেখেছি, আর পরের মেয়ের জন্য এত দরদই বা কিসের!"—বিলাস একটু মুচকে হাসে।

বিপিনবাবু কথা কন্ না। চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত শুধু একটু জ্বলে।

বিলাস আবার বলে, "তাহলে এই কথা রইল?"

"না। তুমি যা খুশী করতে পার এবার।"

বিলাস হঠাৎ গিয়ে বিপিনের হাত ধরে। অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলে, "আহাম্মুক! আমি বৈকূলে তোমার অবস্থাটা তুমি ভেবে দেখেছ একবার! তুমি জেলে পচবে, সে সামান্য কথা, কিন্তু তোমার ওই সাধের মেয়েকে সংসারে কোন আশ্রয় না পেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে শেষ পর্য্যন্ত তা বুঝেছ?"

"তাই ভেবেই তোমার মত জানোয়ারকে দশ হাজার টাকা ঘুস দিয়েছি—কিন্তু তোমার জুলুম আমি সইব না।'

"জুলুম নয় বিপিন, জুলুম নয়"—অত্যন্ত আন্তরিক একটা মিনতির সুর যেন বিলাসের কণ্ঠে বাজে।—"তুমি কি সত্যই কিছু দেখতে পাচ্ছ না! সহরে যে মানুষের দাঁড়াবার জায়গা নেই। দুশ নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে, দুশ আফিস তার সঙ্গে। এত মানুষের জায়গা চাই ত! রাতারাতি যে জমির দর আগুন হয়ে উঠ্‌ছে তা বুঝতে পারছ! কে জোগাবে এ সব জমির মোকামের মশলা! কে এই সহরকে টেনে আনবার ভার নেবে? আমি বলছি, আমায় বিশ্বাস কর বিপিন, তোমার লোকসান হবে না।"

"টাকা ত মাত্র চল্লিশ হাজার! তুমি ত দুনিয়া মাত করছ।"

নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় কণ্ঠস্বর নামিয়ে বিলাস বলে, "ওই চল্লিশ হাজারের বিষয় বন্ধক দিয়ে টেনে টেনে আমি অন্ততঃ লাখের জমি কিনব।"

"কি রকম?"

"মুখ্য, চল্লিশ হাজারের জমি বন্ধক দিয়ে ত্রিশ হাজার পাওয়া যায় কিনা আর সেই ত্রিশে জমি কিনে তার থেকে বন্ধকে বিশ পাওয়া যায় ত ..."

বিপিনবাবু বলেন, "হুঁ, কিন্তু আমার সাহস হয় না।"

ভেতর থেকে লীলা ডাকে, "তোমাদের খাবার জায়গা হয়েছে বাবা!"

খোসা ওঠা মুখটার কঠিন রেখাগুলো কেমন করে যেন সে স্বরে কোমল হয়ে আসে।

পাতার কুঁড়েটিও আছে আর তার সঙ্গে তেঁতুল গাছটিও।

সবাই জমি জায়গা ছেড়েছে দাঁও পেয়ে, বাকী কেবল শিবু। শিবু বলে, "ছাড়ব কেন! আমরা কি সহরে হতে পারি না? আর সহরে সবই ত কোঠা, এখন একটা মেটে ঘর নইলে মানাবে কেন?"

তার তেঁতুল গাছটার কোলদিয়ে নতুন রাস্তাটা একেবারে ঘরের দ্যাল ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিবু ডাকে, "ও হরি, একটু কামিয়ে দিয়ে যাও দাদা।"

বুড়ো হরি নাপিত অত্যন্ত খুশী হয়ে গিয়ে তেঁতুল গাছের মোটা শিকড়টায় ভর দিয়ে বসে। কালো তেলাকুচোর মত মোলায়েম দেহটির মাথায় পাকা সাদা চুলের ছাউনি। মুখে বয়সের একটি রেখাও নেই।

বগলদাবা থেকে নোংরা যন্ত্রপাতির পুঁটলিটি নামিয়ে কাপড়ের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলে, "বাক্স টাক্স নেই বাপু—ওসব বাক্স ফাক্সের ধার ধারি না। বাক্স চাও ত ওই ফকুরের কাছে কামিও বাপু, ওই যে তোমাদের বড় নাপতে হয়েছে গো আজকাল, বাবু ভেইয়ার যার হাতে চুল না কাটলে মাথা কুটকুটোয়। ওই যে ফকুরে থেকে যিনি ফকিরচাঁদ হয়েছেন গো!

"ফকুরে আবার কামাতে শিখ্‌লে কবে?"

ততক্ষণে কামারবাড়ীর সেকেলে, পাথরে-শানান ক্ষুরটি বেরিয়েছে এবং শিশি থেকে পেতলের ছোট বাটীতে খানিকটা জলও ঢালা হয়েছে।

দাড়িতে জল বুলোতে বুলোতে খুশীতে একগাল হেসে হরি বলে, "বল না ভাই, এই কথা বোঝে কে? সেদিনের ছোঁড়া ফকুরে আজ কি না বাবু সেজে বাক্স হাতে হলেন ফকিরচাঁদ! আবার কেরদানি কত? 'জল দিয়ে আবার দাড়ি কামান যায়!' তোর চৌদ্দ পুরুষ যে জল দিয়ে কামিয়েছে রে হতভাগা! আজ গরু শূয়রের চর্ব্বি দেওয়া বিলেতি সাবানগুলো না মখে ঘসলে উনি ক্ষুর চালাতে পারেন না!"

ক্ষুরটা হাতের চেটোয় দুবার শানিয়ে বাঁ-হাতে শিবুর জুলপিটা টেনে ধরে হরি একবার টানে; তারপর ক্ষুরটা আবার হাতের চেটোয় শানাতে শানাতে বলে, "কেমন! টের পেলে একটু?"

ভুরু কুঁচকে অবাক হবার ভাণ করে শিবু বলে, "কই না!"

"আর সেদিন ব্রজবাবু—ওই যে গো নন্দ বাবুদের বাড়ীর নীচে মুদিখানা খুলেছে, বল্লে কি, 'না না, ও সেকেলে ক্ষুরে কামিয়ে কি গালের চামড়াটা খোয়াব!' শোনো কথা! আমিও বলে এলাম, 'তবে ওই ফকুরের বিলিতি-শান ক্ষুরেই কামিও। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আর বাপপিতামর যন্তর বদলে বিলিতি ক্ষুর কিনতে পারব না।"

"তা ত বটেই।'

"আমাদের দেশে আর কেউ ত কখন কামায় নি! ভাগ্যে বিলেত থেকে ক্ষুর এসেছিল! ওরে বাবা, তাতে শান কি—ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা হয়ে যাবে—টেরটিও পাবে না।"

ফোকলা মুখে হরি হো হো করে হাসে, শিবুও হাসে। একগাল ছেড়ে আর এক গাল ধরে' হরি বলে, "তারপর তুমি পানের দোকানটা তুল্লে কেন শিবু? চল্ল না?"

"চল্ল না! মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

"তবে ছাড়লে যে বড়!"

শিবু বিজ্ঞের হাসি হাসে একটু, বলে, "ওইত!" একটু হেসে আবার বলে, "শুকনিকে জান ত?"

হরি হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে। দাড়ি কামান থামিয়ে চুপি চুপি বলে, "লোকটা কে ভাই—বিপিনবাবুর কেউ হয় বলেও ত বোধ হয় না। লাট লাট জমি কিনছে, বাজার বসাচ্ছে, ইটখোলা করছে, ব্যাপারটা কি?'

সবজান্তার মত গম্ভীর ভাবে শিবু আর একবার হাসে। বলে, "আমার সঙ্গে পেরথম দিন আলাপ, একেবারে পেরথম দিন। আমিই সঙ্গে করে ত দিয়ে এলাম বিপিনবাবুর বাড়ী। জাগাজমি কেনার মতলব ত বলতে গেলে আমিই দিলাম।"

রুদ্ধনিশ্বাসে হরি বলে, "তারপর?"

মুখের কাছে মুখ এনে শিবু বলে, "শুকনির বাজার বসছে না? কাউকে যেন বোলো না আবার, ও বাজারের আদায়-পত্তর আমিই করব। শুকনি নিজে এসে অনেক করে ধরলে, কি বল কাজটা মন্দ?"

"না মন্দ কি!" বলে হরি আবার ক্ষুর চালায়—

সাধু ময়রা আড্ডাবাজ রগড়ে লোক। ছোট খাট পাতলা একহারা মানুষটি, বয়সটিকে কেমন করে যেন ফাঁকি দিয়েছে। গোঁফ দাড়ি কামান পাতলা মুখটা চঞ্চুর মত চোখা আর তেমনি তার বচন।

যত আড্ডা তাই তার ঘরে।

সাধু বলে, "ময়রার-পো ভাই, রসমূর্ত্তি একটা প্রাণ ধরে হাতে তুলে দিতে পারব না, তা ছাড়া যা কিছু চাও।"

অর্থাৎ সেখানে ধোঁয়াও ওড়ে, জলও চলে, আবার গুলিও গড়ায়।

আরো সাধু বলে, "তিন কুলে কেউ নেই, একদিন যেন কলকের সঙ্গেই কলজে ফাটে।"

রাত দশটায় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়। তারপর আড্ডা জমে, বিহারী আসে, বিশু আসে, ভৈরব বেরা দোজপক্ষের বৌ ফেলেও আসে মাঝে মাঝে, এমন কি নন্দ মুদিও পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে চীনে বাড়ীর বুট মশমশিয়ে এসে বসে ভাঙা তক্তপোষটার এক ধারে। উটকো লোকেরও বারণ নেই। তাস চলে পাশা চলে, সাধু সুর করে দাশুরায়ের পাঁচলী আর বিদ্যাসুন্দর পড়ে মাঝে মাঝে। গান গল্প ত আছেই।

কিন্তু তবু সেদিন আড্ডা আর জমতে চায় না।

বিশু কলকেটা নামিয়ে রেখে বলে, "না সাধু-দা, তোমার কুমোর বেটা সুনিশ্চিত বাসি কাপড়ে এ কলকের চাকী ঘুরিয়েছিল। নইলে একটু জমল না!"

ন্যাকড়াটা কলকেতে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সাধু

বল্লে, "না গো শুমিচ্‌চিৎ ঠাকুর, গোড়ায় চটাচটি করে সব মজাটি তোমরা ছুটিতে আজ খেচ্‌ছেছ।

হাড়গিলের মত গলাটা বাড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে বিশু বল্লে, "চটামটি আমি করলাম! আমি পেন্নারম্ভে ও আমায় বল্লে কি না চোর! বল না দেখি তোমরা! বল্লে কি না?"

বিহারীর চোখ দুটো বুঝি একটু বুজে আসছিল। চট করে সজাগ হয়ে আরও চোখ দুটো বড় করে বল্লে, "চোরই ত! যেমন জামা তেমনি ফিরিয়ে দিলাম, বল্লে, কি না—'জামা লাট হয়ে গেছে ফিরে নেব না।' ভারী দুটো নিলেমি ছেঁড়া কাপড় নিয়ে দোকানী হয়ে বসেছেন।"

"তা না ত কি! তুইও হ' না দেখি!"

সাধুকে থামাতেই হয়, "ফের সেই ছেঁড়া ঝগড়া!"

বিশু সাধুর হাঁটুটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "তুমি ত ব্যবসাদার! বল না দাদা, দোকান করেছি বলে ত দানছত্তর খুলে বসি নি। নতুন জামাটা নিয়ে গিয়ে সাতদিন বাদে উনি ময়লা করে লাট করে ফিরৎ দিতে এলেন। সে জামা নিলে আর আর বিক্রী হয়! তা ছাড়া ও কলের ছাপা কাপড়ের জামা, ওর পালিশ গেলে আর বেচবো কি!

"আর হয়েছে ত থাক্‌না!" সাধু কল্‌কেটা ভৈরবের দিকে বাড়িয়ে দিলে। অনেকক্ষণ ধরেই ভৈরব উস্‌খুস্‌ করছিল, বল্লে, "না ভাই উঠি।"

ভৈরব উঠে বেরিয়ে গেল কিন্তু খানিক পরে আবার গুড়িসুড়ি মেরে এসে ঢুকে আলগোছে তক্তপোষের একধারে বসে পড়ল।

"ওকি, ফিরে এলে যে!"

ভৈরবের মুখে আর কথা নেই। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ভৈরব অনেক পরে বলে, "চ' না বিশু, তোরও ত ওঠ্‌বার সময় হল। এক সঙ্গেই যাব।"

আবার সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

বিহারী হঠাৎ বলেই ফেলে কিন্তু চুপি চুপি,—"শুকনি বুঝি!"

ভৈরব চুপি চুপি বলে, "হ্যাঁ মাইরী, অন্ধকারে রাস্তার মাঝে ওটাকে দেখলে আমার গা হিম হয়ে যায়! ওটা মানুষ নয় ভাই!"

বিশু অনেক গুলো ঢোক গিলেছে এর মধ্যে, কণ্ঠটা তার আপনাথেকেই ওঠে নাবে। বলে, "ভূত প্রেত না হলে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় চরে বেড়ায়!"

"সাধু বলে, আচ্ছা সত্যি সারারাত ও রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে কেন?"

কেউ কোন কথা বলে না।

ভৈরব শেষে বলে, "তোমার লণ্ঠনটা আজকের মত দাও সাধু-দা, কাল সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সত্যি নতুন সহরের রাস্তায় রাস্তায় সারারাত কে ক্লান্ত চরণ টেনে টেনে ঘুরে বেড়ায়।

লোকে সভয়ে বলে—ও শুকনি!

হয় ত ও সহরের শ্রান্ত কাতর অবরুদ্ধ আত্মা?

নীলিমা বসু

কিছুকাল পূর্ব্বে, কল্লোল-এর প্রথম অবস্থায় বুকপোষ্টে একটি গল্প পাই; তার সঙ্গে একখানা চিঠি। লেখিকা চিঠিতে জানিয়েছেন, লেখার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক্। অনেক রচনাই তাঁকে সঙ্গোপনে রেখে দিতে হয়, কারণ বাড়ীর সকলে কাগজে-পত্রে তাঁর নাম বেরোয় তা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁর স্বামীর এতে খুব সহানুভূতি আছে।

আমি আর গোকুল লেখাটি পড়লাম। লেখার ভঙ্গী ও সংযম আমাদের মুগ্ধ করল। আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে একখানা চিঠি দিলাম, এও জানালাম তাঁর নামটা প্রকাশ করাই সঙ্গত হবে। তখন জানতাম না, তিনি আমাদের কোন বন্ধুরই স্ত্রী। বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা জানতাম না; কিন্তু তিনি যে রাস্তায় থাকতেন, চিঠিতে সে রাস্তারই ঠিকানা ছিল। একদিন গোকুল কথাচ্ছলে বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করে বসল, হ্যাঁ মুরলী বাবু, আপনাদের পাড়া থেকে অমুক নম্বরে একজন লেখিকা আছেন। তিনি আমাদের একটি সুন্দর গল্প পাঠিয়েছেন, আপনি কি তাঁকে চেনেন?—নাম শ্রীনীলিমা বসু।

বন্ধুটি একটু ফাঁপড়েই পড়লেন! শেষে বল্‌লেন, উনি আমারই স্ত্রী।

খুব হাসির ধূম পড়ল। গোকুল ও আমি একটু লজ্জাতেই পড়লাম।

বন্ধুটি পরে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল, গল্পটি ছেপে বেরুলে তিনি স্বামীকে একটা surprise দেবেন।

'বুড়ো-ঝি' প্রভৃতি গল্পগুলি পড়ে তখন থেকেই মনে হয়েছিল, এই অজ্ঞাত লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব নিয়ে প্রবেশ করেছেন। তাই খুব আশান্বিত হয়েছিলাম।

উৎসাহ পেয়ে তাঁর গল্পগুলিও ক্রমে ক্রমে আরও ভাল হতে লাগ্‌ল। সে দিকে তাঁর চেষ্টাও ছিল। পর পর কয়েকটি গল্প কল্লোলে প্রকাশিত হোল। তখন লক্ষ্য করতাম, মাত্র প্রচারের দিকেই তাঁর লক্ষ্য নয়; লেখার ভিতর তাঁর দরদ ও সাহিত্যের জন্য তাঁর অন্তরের প্রীতি গোপন সাধনার বেশেই ধরা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন খুব অল্প। শেষে শুনেছি, তাঁর সাংসারিক কাজ কর্ম্মের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যে টুকু অবসর পেতেন সেইটুকু তিনি সাহিত্যের সেবায়ই ব্যয় করতেন। কল্লোলে প্রকাশিত "ঝরা ফুল" কালিকলমে প্রকাশিত "গোপন ধারা" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি, সংযম, ও প্রকাশভঙ্গীর নিপুণতা লক্ষ্য করেছেন।

এই লেখিকার অকাল তিরোধানে সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অনুভব করছি। তাঁর মৃত্যুতে পরিজনবর্গের হৃদয়-মন বেদনায় বিহ্বল। কিন্তু তারই সঙ্গে মনে হচ্ছে, যে কটি মাত্র পুষ্প স্তবকে নীলিমা দেবী তাঁর অখ্যাত জীবনের সাধনার অর্ঘ্য বাণীমন্দিরে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করে গিয়েছেন, দেবতার আশীর্ব্বাদে তাঁকে তাতেই অমরত্ব দান করবে। এই টুকুই সান্ত্বনা।

বিশেষ কারণে এবারে জাঁ ক্রিস্‌তফ্ প্রকাশিত হইল না। আগামী বার হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। অন্য নূতন বিষয়ও থাকিবে।—সম্পাদক।

চার বৎসর কাটিয়া গেল। আজ সেই শুভদিনের কথা মনে পড়ে যে দিন হৃদয়ের বিপুল উৎসাহ, অন্তরের একটা শুভ কামনা লইয়া কল্লোলের জন্মোৎসব হয়। তাহার পরে বন্ধুবর্গের সহানুভূতি, লেখকবর্গের সাহায্য ও আনন্দের আবাহনে কল্লোল সার্থক হইল। দেশের লোক ইহাকে গ্রহণ করিল ; ইহার সমস্ত ত্রুটি ও অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া ইহাকে সম্ভাষণ দিল ! যে নূতন আবেগ ও চিন্তার সম্ভার লইয়া কল্লোল জনসমাজে উপস্থিত হইল তাহাই তাহাকে বাঙলার সুধীবর্গের নিকট পরিচিত করিল। সম্বল বা সৌভাগ্যের সঙ্গতি তাহার কিছুই ছিল না। ইহার আদর্শই মানুষকে মুগ্ধ করিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিরাভরণ এই ছোট মাসিক পত্রিকাখানি বাঙালীর মনের সমাদর লাভ করিল। মনের কথা, মনের বেদনা ও আনন্দের প্রবাহ ইহাকে যাত্রা-পথে শক্তি দিল, ইহার অস্তিত্বকে রক্ষা করিল। তাহার পর, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মানুষের হাসি-কান্নার প্রবাহ লইয়া কল্লোল সহস্র বাধা ও বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাহার জন্মশিখর হইতে বহিয়া চলিয়াছে। মৃত্যুর আঘাত তাহাকে উদ্বেল করিয়াছে, নিষ্ঠুর অবহেলা তাহাকে ব্যথা দিয়াছে, দুর্ভাগ্যের সহস্র ব্যাঘাত তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মানব-হৃদয়ের যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা হইতে তাহার জন্ম ও সাধন, কোনও শক্তিই সে প্রবাহ ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মনের সংকল্পে যে নিষ্ঠা তাহাই তাহাকে মৃত্যুর মোহনা হইতে মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ তাহার কত পর আপন হইয়াছে। কত অপরিচিত তাহার সত্তাকে নিজ মনের আকুলতা দিয়া ধন্য করিয়া তুলিয়াছেন। কাহারও একজনের মনের আবেগ লইয়া ইহার অস্তিত্ব নয়, ইহাই কল্লোলের সার্থকতা। বহুজনের ব্যাকুল বেদনা ও আনন্দের অযুত তরঙ্গ ইহাতে ঠাঁই পাইয়াছে।

আজ তাই পঞ্চম বৎসরের নব প্রভাতে ইহার দেহ রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ নৃত্যসঙ্গীতসৌন্দর্য্যে ইহার কিশোর দেহ তরুণী বাঙলার বক্ষে স্থান পাইয়াছে। আজ নববর্ষের শুভ মঞ্জরী অঞ্চলে লইয়া কল্যাণী বাঙলা আমাদের, বিশ্বলোকের সমুদ্রস্নানে যাত্রা করিয়াছেন। আজ অবিশ্বাস আক্ষেপের অবসর

নাই। আকাশের নীল প্রাসাদ হইতে শাদা মেঘের শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছে। আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার মুক্ত। দুঃখী কাঙাল, নবীন প্রবীন, সকলের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। আজ উৎসাহে তাই সকলকে ডাকিয়া বলিতে চাই, উপেক্ষার সঙ্কীর্ণতায় আর কাহাকেও পর করিয়া রাখিও না, হিংসার বিষ-বাহু ঘেরিয়া আর মানুষকে দুঃখ দিও না; আজ মানুষকে ছাপাইয়া মহা-মানবের সন্ধান লও। তোমার ভিতরে যাহাকে পাইতে চাও, প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই তাহার দেখা পাইবে। শত সূর্য্যের আভায় অন্তরের অন্ধকার কক্ষ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে। তোমার শীত শীর্ণ অন্তরের প্রবাহে একটি নূতন মানুষকে দেখিতে পাইবে; চিরচঞ্চল অমৃতের সন্ধানী এক গোপনচারী মানবাত্মা নিঃশব্দ ক্ষেপনী বাহিয়া আনন্দসমুদ্রের দিকে যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে। নিখিলের এই অন্তহীন যাত্রীসংঘে আপনাকে খুঁজিয়া লও।

এই কয় বৎসরে কল্লোলের লেখায় অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। তাহা আমাদের অজানা নয়। নবীন লেখক-দিগের রচনা লইয়া অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে-ছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, স্নেহ ও মমতায় ইঁহাদের আবদ্ধ করুন। যে অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহারা লেখক রূপে পরিচিত হইয়াছেন, তাহাই ইঁহাদের শক্তির পরিচয়। চিন্তার ধারা হয় ত বিচ্ছিন্ন, কোথাও কোথাও আজও ম্লান, রচনাভঙ্গী অপটু কিন্তু তবুও ইঁহাদেরই আজ সময় দিতে হইবে, সুযোগ দিতে হইবে। সময়ের সঙ্গে তাঁহাদের ধারণা, চিন্তার ধারা আরও সরস ও সুন্দর হইবে ইহাই আশা হয় না কি? মানুষের জীবনের বা স্বভাবের স্বচ্ছতাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লেখার ভিতরে যেটুকু আবিলতা আসিয়া পড়ে তাহা মানুষের সংস্কারকে আঘাত দেয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যেও যে শক্তি ও শুভ ইচ্ছার প্রেরণা থাকে তাহা বুঝিয়া অসামঞ্জস্য যতটুকু থাকে তাহা সহ্য করা সম্ভব। এই কল্লোলের কয়েক বৎসরের জীবনেই আমরা যত নূতন লেখকের রচনা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এই টুকুই বুঝিয়াছি, প্রত্যেক লেখকেরই ইচ্ছা, যাহা ভাল তাহাই লিখিবেন এবং এই ধারণা লইয়াই যে সকল জিনিষ তাঁহা-দের নিজের মনকে পীড়া দিয়াছে, বেদনায় বিহ্বল করিয়াছে তাহাই লেখায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অক্ষমতা হেতু অনেক লেখাতেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। সাধারণতঃ একটি লাইন বা একটি শব্দ লইয়া সমগ্র লেখার বিচার করা সঙ্গত নয়। লেখকের উদ্দেশ্য কি, আদর্শ কি তাহা জানিতে হইলে সমগ্র লেখাটি পাঠ করিবার সময় সহিষ্ণুতা আবশ্যক, কিছু ভাল গ্রহণ করিব এরূপ কামনা থাকাও দরকার। নচেৎ অনেক সময়ই লেখকের প্রতি এবং লেখার প্রতি অবিচারই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের কাছে যে সকল লেখা আসে, আমরা তাহার প্রায় প্রত্যেক লেখাই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া থাকি এবং তাহারই ভিতর হইতে যে লেখায় কিছু ক্ষমতার পরিচয় পাই তাহা সম্পাদন ও সংশোধন করিয়া অনেক সময় প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহা না করিলে হয় ত আজ বাংলাদেশের অনেক লেখকই অবজ্ঞাত থাকিতেন। ইহারই মধ্যে যাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল, অন্তর্দৃষ্টি যাঁহাদের প্রখর ছিল তাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন।

কেবলই অবহেলার চক্ষে দেখিলে, এক নিজেকে ছাড়া কোনও মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না। শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মনের এই অবস্থা। তাহা সত্ত্বেও যে আজ বাংলা দেশে সমালোচকদের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি সহিয়া এই নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে ইহা বর্ত্তমানকালে অনেকেরই মনের মত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে যে নূতন শক্তি আনয়ন করিয়াছে— তাহা উত্তরকালে স্বীকার করিতেই হইবে।

যাঁহারা আজ সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও এককালে নবীন ও তরুণ ছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু তখন তাঁহাদের যে কোথাও

শক্তি বা সাহসের অভাব ছিল এ কথা কি আজ তাঁহাদের মনে হয়? সাহস ও দুঃসাহস দুই ভিন্ন জিনিষ। আমরা সাহসের কথাই বলিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন কোনও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির আওতায় বাড়িয়া উঠিতেন। এখনও অনেকে তাহাই প্রসিদ্ধি-লাভের সুগম পথ বলিয়া ধরিয়া বহিয়াছেন। তাঁহারাই নবীন লেখকদের এই আত্মনির্ভরতার প্রগাঢ় সাহসকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন না।

নতুনকে বাদ দিবার উপায় নাই। পুরাতনের সহিত বর্ত্তমানের যোগসূত্র বাঁধিয়া রাখিতে নূতন আসিয়া থাকে। দেশের অবস্থার ভিতর দিয়া তরুণের মনে যে বেদনা ও আনন্দের অনুভূতি বাসা বাঁধিয়া ওঠে তাহাই তাহার ভাষাকে আশ্রয় করে। দেশের সাহিত্য দেশে দেশে এ ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা কালের স্পর্শে ভাঙিয়া গিয়াছে, যাহা দেশকে লইয়া, দেশান্তরকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা আজও কালের বিচিত্র অবস্থার মধ্যেও সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কোন্‌টা থাকিবে কোন্‌টা থাকিবে না তাহা লইয়া আজই বিচার করিবার সময় নয়।

মানুষ কোনও কালে বর্ত্তমানকে সমগ্রভাবে ধারণা করিতে পারে নাই। দেখা গিয়াছে, অনেক অগ্রাহ্য বর্ত্তমানরহস্য একদিন আপনগুণে মানুষের মনকে এক নবরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অখ্যাত অবহেলিত লেখক তখন সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন।

তাহা বলিয়া ইহাও কথা নয় যে, নূতনত্বের দোহাই দিয়া কেবল অসার যাহা কিছু তাহারই প্রশ্রয় দিতে হইবে। এ কথাটি লেখকদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যাহা তোমার মধ্যে রূপ পাইয়াছে তাহা তোমার রচনার সাহায্যে লোক চক্ষুতে প্রকাশ পাইতেছে। সমগ্র মানুষের অন্তরলোকের কথা তোমার অন্তরে জাগ্রত হইতেছে কি না তাহা বিবেচনা ও বিচার করিতে হইবে। মানুষের মনে অনেক কথাই আসে। তাহা সবই প্রকাশ করিলে কাহারও বিশেষত্ব কিছু থাকে না। সাধারণ বিষয়ে প্রায় সব মানুষই এক ধরণে ভাবে, এক ভাবে কল্পনা করে। সেই কারণে সব মানুষই পাপী, সব মানুষই পুণ্যাত্মা। কিন্তু তাহার বাহিরে যে মানুষের মনুষ্যত্বের একটা বিপুল সত্তা আছে তাহাই কামনার বস্তু, তাহাই লোভনীয়। লেখককে ধ্যানযোগে সেই অপরূপ মনুষ্যত্বেরই আরাধনা করিতে হয়, মানসলোকে তখন যে একটি মাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি উদ্‌ভাসিত হয়, তাহাই মানুষের আসল রূপ। সকল ব্যথার উচ্চে, সকল কামনার ভিতর দিয়াই এই মানুষটির জন্ম হয়। ইহারই কথা ভাবিয়া লেখকের ভাষা পরিচয়ের নিমন্ত্রণলিপি দিকে দিকে প্রেরণ করে। এই নিমন্ত্রণে তাই সমগ্র মানব মন সাড়া দিয়া ওঠে।

আজ তাই নেপালী যুবক খড়্‌গ্ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ-লিপি মানুষের মনকে জাগাইয়া দিয়াছে। ইহা নীচতার সহিত সংগ্রামের জন্য আহ্বান। মানুষের মনই এই নীচতার পোষণ করে, আবার মানুষের মনই এই নীচতায় বিক্ষুব্ধ হয়। সমগ্র মানুষের হইয়া খড়্‌গ্ বাহাদুর ধ্যানলোকে নারীর এই বেদনার মূর্ত্তিটিরই দেখা পাইয়াছিল। তাই রক্তের লেখায় অত্যাচারীর নিষ্ঠুর কাহিনী সে আজ বিশ্বের দিক্ দিগন্তে পাঠাইয়া দিয়া মানুষকে এই নির্দ্দয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ডাক দিয়াছে। শুধু রাজকুমারীর মর্ম্মব্যথাই তাহাকে ব্যাকুল করে নাই, সমগ্র প্রপীড়িতা নারীর আর্ত্ত আহ্বানের সেই প্রচণ্ড ক্রন্দধ্বনি তাহার অন্তরের সেই গোপনচারী মনুষ্যত্বকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ করিয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের এই নিমন্ত্রণ ভারতের পবিত্র অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। দেশ দেশান্তরের মানুষ-দেবতা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। বিধাতার শক্তির ভাণ্ডার আজ মুক্ত, মানুষ নিজ নিজ সংগ্রাম-শল্য বাছিয়া লইয়াছে। কল্যাণী পৃথিবী তরুণের এই অভিযানের দিকে প্রতীক্ষার চক্ষে চাহিয়া আছেন। যুগে যুগে এই প্রতীক্ষা সার্থকও হইয়াছে।

র্সা ধনা পধা মপা | গমা মগা পা পা না ধা | -া -া র্সা র্সা র্সা র্সনধা | ধপা পধা র্সনা ধা পক্ষা পা |

দা রুণ ত ম প র ম ক্ষ তি - - - জ্বাল্‌ বে যে দিন চি তা - র জ্যো তি

পা -া ধপা র্সর্রা র্সা না | ধা ধপা -া মা গা -া | গা গা -া মা ধপা ক্ষপা | গমা মগা -া রসা সা -া |

নি - র্বা - পে রি পা শা য় হৃ দ য় চ র ণ ত লে - চে য়ে - র বে -

-া -া সা গা মা পা | পধা পগা পা মা গা -া | গা গমা পধা ণা ধা পা | গমা মগা -া

- সে দিন আ মার তো মা য় পাও য়া - স হ - -জ হ বে স হ জ

মা পা ক্ষ পা—II II

হ বে -

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by K. P. Das,
at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

কবি ফেরদৌসী
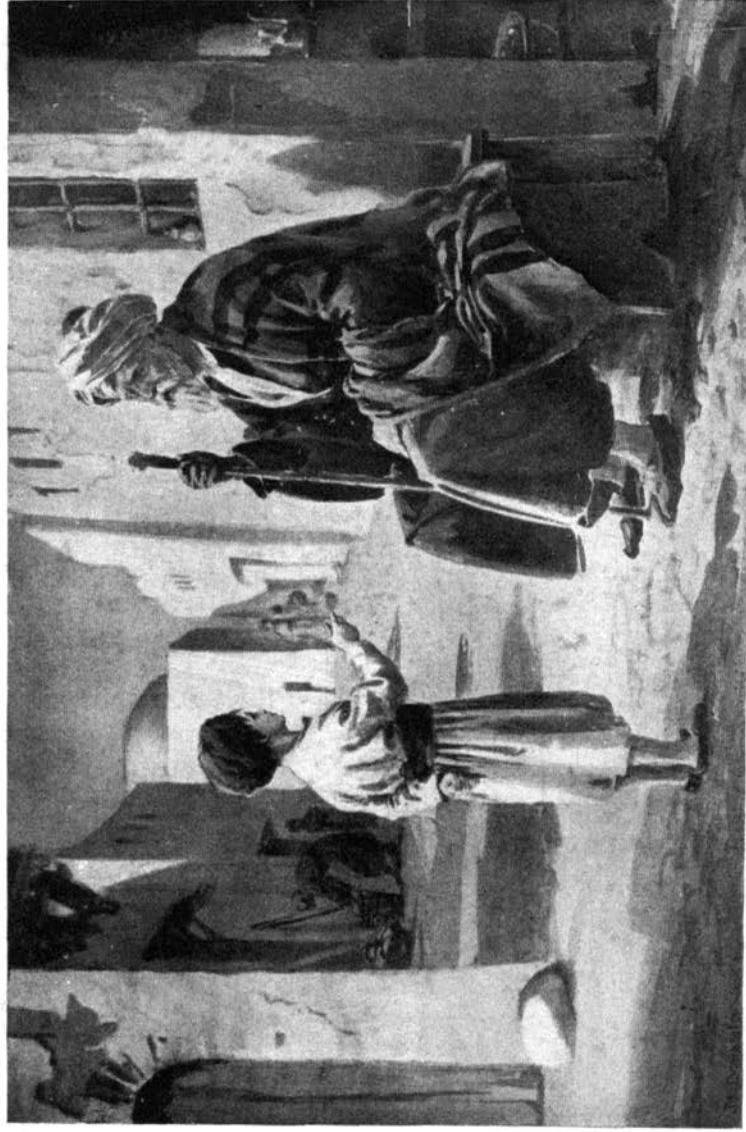
কল্লোল
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

অ-ধরা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

হে চির সুন্দর,
মানুষ চাহিছে তোমা' যুগযুগান্তর
আপনার হৃদয়ের মাঝে।
সকল চেষ্টায় তা'র তুচ্ছতম কাজে
তোমার ক্ষণিক স্পর্শ সে যে পেতে চায় ;
না-পাওয়ার বেদনায় দিন তা'র ধীরে চ'লে যায়।

কুৎসিতের মহামেলা চলিয়াছে রাত্রিদিন ধরি ;
হে সুন্দর, কবে তুমি আপনা পাসরি'
কাহারে পরশি' যাও সে ত নাহি জানে ;
সহসা ব্যাকুল বাণী জাগে তা'র প্রাণে ;
ভাষা তা'র গুমরিয়া মরে।
না-বলার বেদনায় অশ্রু তা'র ধীরে পড়ে ঝ'রে।

হে পরশ-মণি,
তোমারে যে ভালোবাসে, তা'রে তুমি এখনো চেনোনি ;
তুমি যা'রে চাও,
তা'রে তুমি সব দিয়ে যাও ;—
চাহো না যে ফিরে—
ব্যর্থতা কোথায় কা'র, বক্ষ বসি' চি'রে।

অ-ধরা, তোমার পিছে ভিখারী যে চলে নিশি দিন ;
ছিন্ন তা'র হৃদয়ের বীণ ;
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ—
আলো যে ফুরায় ;
এ চলার শেষ নাহি হায় ।

হে চির-সুন্দর,
রুদ্র জানি তব সাথী ; ব্যথা জানি তব অনুচর ;
ক্লেশের কণ্টক-পথ পরে
যাত্রীর চরণ-রক্ত প'ড়ে যায় ঝ'রে ;
জাতির কল্যাণ-পথে ধ্বংসে তুমি পাঠাও নীরবে ।
তা'র পরে যবে,
ক্ষতির পাটল-পুষ্প ভক্ত তোমা' দেয় উপহার,
নির্দ্দয়, তখনো তুমি অন্তরালে প্রসারি' আঁধার
দুই পায়ে দলি' তা'রে যাও ;
ফিরে নাহি চাও ।—
যা'রে তুমি ভালোবাস, তা'রে তব সকলি বিলাও ।

লক্ষ্মীছাড়া

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাদিন গেছে—সন্ধ্যা হয়, জল ভিন্ন ভোলার আর কিছু জোটেনি। মানুষের কাছে চাইতে তার আর সাহস নেই,—ভিখিরীর কাছে—স্বতীর্থের কাছে অসঙ্কোচে হাত পাতে। না পায়,—কষ্ট পায় না।

আজ ভিখিরীও মেলেনি। খড়দার বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ—বোধ হয় সেই খানে সব গেছে।

ভোলা ধীরে ধীরে চলেছে।

হাজার লোক খেয়ে গেছে। উচ্ছিষ্ট বুকে করে কলা-পাত আর ক্ষীরের খুরি—সামনের খানায় স্তুপাকার। কুকুরেরা কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে।

আমি আর কে—আমিও আছি রে ভাই!

ভোলা নেবে পড়ল। পেটের হুকুম!

দেখে বাবুরা হেসে বলে যায়—পাগল!

ছেলে মেয়েরা খেলছিল। পাগল শুনে, দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মজা দেখতে লাগলো।

একটা কুকুর—হাতটা কামড়ে রক্তপাত করে দিলে।

ভোলা হেসে বললে—মরব' মা ভাই—মরব না। জগতের দুখ কষ্ট মারধোর ফুরিয়ে গেল নাকি! তা ভেব না।

পাতা কুড়িয়ে কুকুরকে ও' দেয়—খা-খা।

তিন চার বছরের মেয়েটি ছুটে এসে বললে—আহা বড্ড লেগেছে—বাছারে! তুমি কাঁদচো না?—লক্ষ্মী ছেলে। লুচি খাবে?

এই বলে তার হাতের আধখানা লুচি ছুঁড়ে দিলে।—জ্ঞান হয় নি কি না!

একটু সন্দেশ খাও।—আধখানা খেয়ে অর্দ্ধেক দিলে।

কুকুরের মুখ বাঁচিয়ে ভোলা মুখে পুরলে।

কে মা তুমি অন্নপূর্ণা! কোলে করতে যে বড় ইচ্ছে হচ্ছে!

দু'বছরে সন্দেশের স্বাদ ভুলিনি তো,—ঠিক্ তাই আছে!

না-ভোলাটাই সাজা!

বাবুদের সব জুড়ি-গাড়ী এসেছিল। ঘোড়ারা দানা খাচ্ছে।

তাদের মুখ থেকে যা ছট্‌কে পড়ছিল—তাই খুঁটেই ভোর-পেট।

আজ কি সুপ্রভাত!

*

*　　*

পরাণের সঙ্গে দেখা। কামারহাটির কল তিন দিন বন্ধ, সে বাড়ী যাচ্ছে।

বললে,—একি—পাখা-টানা কাজ কি হল! যাস্‌নি?

সে কাজ আর নেই।

তাই এমন মূর্ত্তি! খোঁড়া মানুষ—তবে আর কোন্ কাজ করবি? তা—ছাড়্‌লি কেন?

একজন তিন চারটি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে সাহেবের কাছে বড় কাঁদতে লাগলো,—খেতে পায় না। ছেলেদের মা মরে গেছে।

সাহেব বললে,—খালি হলে এস, এখন খালি নেই।

বড় বাবু দাঁড়াতে দিলে না—তাড়িয়ে দিলে।

পরাণ বললে—বড় বাবুদের ওইটেই তো বড় কাজ!

সে দিন তাদের খাওয়া হয় নি। ছোট ছেলেটা খিদেয় খাবি খাচ্ছে—নেতিয়ে পড়েছে।

আমার কাছে ভাই তিন গণ্ডা বই ছিল না। তাই দিয়ে বললুম—ওদের কিছু কিনে খাওয়াও। কাল কাজ খালি হবে—তুমি এসো।

অমন চাকরিটে তাকে দিয়ে দিলি!

সে-মুখ যদি দেখতিস্! আমার আর কে আছে?—

হ্যাঁ পরাণ ভাই—লক্ষ্মী আমার কথা কয়,—কেমন আছে সে?

তার নাম আর মুখে আনিস্ নি। বেইমান ছুঁড়ি কিনা ছিরু সদ্দারকে—

না ভাই—গাল দিস্ নি। কলে আমার পা গেল, তার দোষ কি!

ভোলার বুকটা ফুলে উঠে নাকদে' খানিকটে গরম হাওয়া বেরিয়ে গেল।

—কোনো কথা কয় না?

ছাই কয়! সেদিন বলছিল বটে—ভোলা থাকলে কি আমার অমন পাঁটাটে চুরি যায়! সারারাত সে এই দাওয়াটিতে পড়ে থাকতো!

বলেছে!

ভারী বলেছে!

তুই বুঝতে পারিস নি পরাণ ভাই। অতবড় কথা বলেছে আবার কি বলবে। ভুলতে কি পারে!

যা-যা, ভোলা কুকুর কিনা—তার পাঁটা চৌকি দিতো! নেমকহারাম—

গাল দিসনি ভাই, ওর মধ্যে কত বড় কথা রয়েছে। লক্ষ্মী জানে—আমি ঘুমুতুম না। ব্যস্—তা'হলেই হল।

উঃ—ভারী হল! স্বর্গে বাতি হল'!

সত্যিই হল' ভাই! ওই কথাটিই আমার বুক আলো করে থাকবে—আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

পরাণ অবাক হয়ে বিরক্তি মিশ্রিত দুঃখে তার দিকে চেয়ে রইল।

তার চোখ দেখেছিস তো? আমি চারদিকে চেয়ে দেখি—সে চোখ আর দেখতে পাইনা, কোথাও নেই!

ভোলা থাম্। পা গেছে, মাথাটা আর খোয়াস নি।

তুই ভালো করে' দেখিসনি পরাণ ভাই। লোকে বলে—হরিণের চোখ—হরিণের চোখ;—সে দিন তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরিণের চোখ দেখলুম। ছোঃ, কিছুনা—কিছুনা—মাইরি বলছি!

যে দরদ বুঝলে না—সে তো অন্ধ, তার আবার চোখ কি!

বোঝে বোঝে, খুব বোঝে। তা না তো অমন কথাটা কয়,—উঃ!—তুই কারুকে ভালোবাসিস না পরাণ ভাই!

বাস্‌তে চাইনে,—চললুম। তোর খাওয়া হয়েছে?

আজ আর কিছু দরকার হবে না—ভোরপুর!

তবে চললুম।

আমার দুক্‌খু কষ্ট তাকে যেন জানাস নি ভাই,—তাকে বড় বাজবে।

উঃ, মরে যাবে সে!

পরাণ চলে গেল।

ভোলা অন্যমনস্ক হয়ে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে, শুষ্ক হাসি হেসে আপনা আপনি বললে—পরাণ ভাই কিছু বোঝে না।

আকাশের বুকটার ভেতর কত পাখী কতদিকে উধাও ছুটেছে। সকলে কি সব গুলোকে দেখতে পায়! গোটা কতক—কাক চীল শকুনই চোখে পড়ে।

* *

*

বিকেল বেলাটা।

বীরেন উকীলের বাড়ীর সামনের মাঠে ছেলে মেয়েরা খেলছিল।

ভোলা তাই দেখছিল। বোধহয়—লক্ষ্মীর চোখ খুঁজছিল।

খাওয়া হয়নি।

ঊর্ম্মিলা ন'বছরের মেয়ে। ছোট ভাইটিকে কোলে করে খেলছিল।

সহসা তাদের চোখের আলো নিবে গেল,—হাসি খুসি থেমে গেল।

ভাইটির গলায় হার ছিল,—দেখতে পাচ্ছে না!

মাঠময় খোঁজা চললো,—সন্ধ্যা হয়ে আসে।

সে যে নতুন হার—অনেক টাকার। বাবা আমাকে আস্তো রাখবে না!—উর্ম্মিলা কেঁদে উঠলো।

কি হয়েছে দিদি?

মণ্টুর গলার হার কোথায় পড়ে গেছে, পাচ্ছিনা,—খুঁজে দাওনা গা!

দেখছি দিদি।

বাড়ীতে খবর পৌছে গেল।

বীরেন-উকীল মকদ্দমা হেরে—মন-মরা মেজাজে বাড়ী ঢুকতেই—এই সংবাদ!

অগ্নিমূর্ত্তিতে ধূলো-পায়েই ছুটে আসছিলেন।

ঐ যে দিদি—তোমার পায়ের কাছে, বলেই—ভোলা হারছড়াটি কুড়িয়ে উর্ম্মিলার হাতে দিলে।

তুমি আমাকে বাঁচালে—তা না তো—

বীরেন বাবু বীরদর্পে এসেই ভোলাকে কিল আর চাপড়।

সে পড়ে গেল।

এই যে হার বাবা,—আহা মের না বাবা, মের না। ওই-ই তো খুঁজে দিলে—

খুঁজে দিলে! বদমাইস চোর। আমি বুঝি না,—দিন রাত ওই কাজ করছি।

বুকে তিন লাথি।

ওগো মের না গো,—ও খোঁড়া মানুষ! উর্ম্মিলা কেঁদে উঠলো।

কাল এ তল্লাটে দেখতে পাই তো পুলিশে দেবো,—জানিস আমি কে!—

মেয়ের হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা মেরে বল্লেন,—চল্ বাড়ী।

সবাই চলে গেল। অনাহার আর ভীম-প্রহার নিয়ে পড়ে রইল ভোলা,—অজ্ঞান।

কুকুর এসে শুঁকে গেল। আহা আহা করলে কেবল বাতাস। আর—মরি মরি করে' অশথ গাছের শুক্‌নো পাতাগুলো তার চারদিক ছুটে এসে জড় হল।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা নিয়ে কখন জ্ঞান এল কেউ জানে না। ভোলা পড়েই রইলো—জ্বর।

নিস্পন্দ পড়ে থাকতে দেখে অতি প্রত্যুষে বীরেন বাবু শঙ্কিত মনে, দুর্গা নাম স্মরণ করতে করতে এলেন।

বেঁচে আছে দেখে,—বীরের মত শাসাতে শাসাতে ফিরলেন,—নিশ্চিন্ত হয়ে।

* *

*

খোরাক না পেলে কেউ বাঁচেনা,—জ্বরও না। দু'দিন শুকিয়ে সে সরে গেল।

একি! রোদে প'ড়ে যে!—ফিরতি বেলায় পরাণ বললে।

বড় মার খেয়েছি পরাণ ভাই,—ভারী বেদ্‌না।

কে মারলে?

আরে ভাই, খোদা মারলে—সবাই মারে। সে যা'ক্—লক্ষ্মী ভালো আছে ত'—কিছু বললে?—উঃ, নিশ্বেস টানতে লাগে!

তোর এই হাল করেছে,—ভালো থাকবে বই কি!

কেন,—কি পরাণ ভাই, কি হয়েছে তার? আমার তো সে কিছু করে নি! ভগবান জানেন—আমি তার ভালই চাই—

লক্ষ্মী ছিমন্ত স্যাকরার দোকানে একজোড়া অনন্ত দেখে এসে ছিরুর কাছে সেই রকম অনন্ত চায়,—পুজোর সময় দিতেই হবে! ছিরুর আর দেরি সইলো না,—দশ দিন পরেই ঠিক সেই রকম অনন্ত এনে দেয়।—

এনে দেয়!

লক্ষ্মীর সোবে হয়,—এত শীগ্‌গির দুশো টাকার জিনিস দিলে কি করে,—এ বোধ হয় সোনার নয়। সে চুপি চুপি ছিমন্ত স্যাকরার দোকানে যাচাই করাতে গিয়ে ধরা পড়ে।

ছিমন্তর দোকানের ঝাঁপ কেটে ওই অনন্ত চুরি হয়েছে—সে পুলিশে লিখিয়ে এসেছিল।

লক্ষ্মীর দোষ কি,—সে কোথায়?

লক্ষ্মীকে ছেড়ে রেখেছে,—কি হবে কে জানে। ছিরু হাজতে, এই শুক্কুরবার মামলা।—ছিমন্ত বীরেন উকীলকে ধরেছে,—মস্ত উকীল, ভারী কড়া লোক। বলেছে—তিন বছর ঠুক্‌বে।

লক্ষ্মী কি করছে পরাণ ভাই,—তার তো কোনো দোষ নেই।

কেঁদে কেঁদে মরছে,—আর কি করবে। প্যাচে না পড়লে তো সত্যি কথা বেরয় না, এখন বলে,—ভোলাও চলে গেল,—আপনার বলতে সে-ই আমার ছিল। তার চেয়ে আর আমার ভালো চাইতো কে,—তাকে কিছু বলতে হত? তাকে কি আমি যেতে বলেছিলুম। আমার কপাল। এ ছাড়া আর বলবে কি—বলবার মুখ রেখেছে!

বলে,—কোথায় যে গেল,—একবারটি দেখাও দেয় না, কেমন আছে খবরও পাই না। আমি কি সাধ করে এমন করেছিলুম! এ কথা সেও বুঝলো না।

ভোলা চোখ মুছে বললে,—বলে?—দেখছিস্ পরাণ ভাই। আমি জানি,—তা সে কি করবে। এই বয়সে একফাটি বড় চিন্তেয় পড়েছে,—যে চোখ শুধু হাসবে—সেই চোখে জল!

ভোলা একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে,—চোখে জল বেরিয়ে এলো।

উদাসভাবে বললে,—তার জন্যে ভোলা কি না করতে পারতো!

বেশ তো—এইবার তুই যা না।

হুঁ—যাবো। দেখ পরাণ ভাই,—ভালোবাসার নাগাল নেই। ভাবতুম, আমার চেয়ে লক্ষ্মীকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। সে দেমাক ছিরু ভেঙে দেছে। সে-ই ওকে ভালো রাখবে,—ভালো রাখতে পারবে।

এখন তিন বছর তো ঘানি ঘোরাক!

গায় লাগবে না পরাণ ভাই,—তার গায় লাগবে না। ঘানি তো বাইরে ঘুরবে, লক্ষ্মী যার মনে ঘুরবে—তার গায়ে লাগ্‌বে না! আমার তো কতদিন না খেয়েই—শুধু মার খেয়ে, গাল খেয়ে, তাড়া খেয়ে কাটে! তাতে কি?

তবে যাবি নি?

হুঁ—যাব বই কি,—কি বার—শুক্কুরবার?

হ্যাঁ—শুক্কুরবার মকদ্দমা। এই মওকা,—বুঝলি?

আচ্ছা পরাণ ভাই—তোর কথা ভুলব না।

পরাণ চলে গেল।

আকাশে অসংখ্য তারা—সারারাত নীচের পানে চেয়ে আছে। কে কাকে দেখবার জন্যে রাত জাগছে, কার মন কোথায় পড়ে আছে, কাকে খুঁজছে, পাশাপাশি থেকেও কেউ কারুর কথা জানে না--কারুর মন বোঝে না।

কোনোটা জলতে জলতে ছুটে সোঁ করে নেবে আসে—নিজেকে খাক্ করে ফেলে! কেনো? তা কে বুঝবে! বোধ হয় যাকে চায়, পায় না।—আসে তো!

যাবো রে লক্ষ্মী যাবো।

ভোলা গাছ তলায় শুয়ে পড়লো,—বসতে পারলে না। উত্তেজনায় বুকটা দপ্ দপ্ করতে লাগলো।

চোখ বুজে আপন মনে বলে গেল—হাঁ,—ছিরু তাকে ভালো না বাসলে কি এত বড় কাজ করতে পারে! যে-সে ভালোবাসা নয়, উঁহু।

ধাক্কার মত একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে তাকে উপুড় করে দিলে।

একবার চিৎ একবার উপুড়,—দিন রাত কেটে গেল।

রাস্তা দিয়ে কত লোক এলো গেল, কেউ খোঁজও নিলে না।

কেউ বললে,—যত পাপ কি এই গাঁয়েই এসে জোটে!

সঙ্গী বললে,—এতো শুড় আর পাবে কোথা!

একজন বলে গেল,—মরবে নাকি! রোগ ছড়াতে আবার কে এলো! কমিসনাররা কি ঘুমুচ্ছেন?—

তাঁদের আর কাজটা কি!

সন্ধ্যা হয়ে আসে,—ভোলার পেটে কিছু পড়েনি!

সে মাঝে মাঝে চাইছিল—যদি কোনো ভিক্ষুক নজরে পড়ে,—মানুষে কিছু দেয় না।

* * *

কে রে ভাই?—আমার অট্টালিকাটাই পছন্দ হল! তা থাক্-থাক্, মস্ত দালান! মাঝে মাঝে এ বাড়ীতেও থাকি,—এমন অনেক আছে।

ভোলা চেয়ে দেখে—আপনার জন এসেছে!

লাঠি, পেতলের একটা কানা ভাঙা ঘটি আর ঝোলা ঘাসের ওপর ফেলে,—একটি ঢ্যাঙা রোগা, মলিন, এক-বস্ত্র লোক, বড় বড় আধ পাকা চুল-দাড়ি,—আপন মনে গুন্ গুন্ করতে করতে করতে উবু হয়ে বস্‌ছে—

এবার রেখেছ বেশ ভালো
সন্ধ্যে হলে নিবাও বাতি—
সকাল হলে প্রদীপ জ্বালো!

এতক্ষণে ভোলা তার পরমাত্মীয় পেলে! অসঙ্কোচে মৃদু কণ্ঠে বললে—

বাবাজি—খিদে-তেষ্টায় মরে গেলুম, উঠতে পারছি না! দু দিন পেটে কিছু পায়নি,—একটু জল যদি খাওয়াও।

সে কি! শুধু জল? অতিথি—নারায়ণ!—

ঝোলা থেকে দু'মুঠো ভিক্ষের-চাল ভোলার হাতে দিয়ে বললে,—

নারায়ণ, লক্ষ্মী তো তোমারি, এবার ঘরে এলেন না,—সে তাঁর মরজি! এ পরের লক্ষ্মী ভাই—মাথায় ঠেকিয়ে সেবা করো,—জল আনি।

ভোলা উঠে বসেছিল! অবাক হয়ে চেয়ে রইলো!—এ যে নিজেরই একতারা,—বে-সুর বলে কি!

বুকটা ঠেলে উঠে মুখটা ফাঁক করে দিলে।

চাল চিবিয়ে—একপেট জল খেলে—আঃ!

নাও,—পা লম্বা করে শুয়ে পড়ো। বিছনা-বালিস খুঁজতে হবে না, লোহার সিন্দুক আগলাতে হবে না, কালকের চিন্তাও নেই। বেশ রেখেছ হরি, রাজা—রাজা!

* * *

সকাল হয়েছে,—কোন্ রাস্তা ধরবে?

বুকে বড় ব্যথা বন্ধু!

সেটা তো থাকবেই, তা না তো কি নিয়ে থাকি! ওই তো পুঁজি! ব্যথা বইতেই যে ওর সুখরে ভাই।

আচ্ছা, তবে দু'টি রেস্তো রাখো।

থলি ঝেড়ে দিয়ে চলে গেল।

উঠতে যে পাচ্ছি না! নাঃ যেমন করে হ'ক যেতেই হবে।

পরাণ ভাই ঠিক্ বলেছে—মওকা!

লক্ষ্মী বলে—ভোলা নেই, আমাকে আর কে দেখবে! উঃ

যাব রে লক্ষ্মী, যাবো।

অন্যমনস্ক হয়ে ভোলা ভাবতে লাগলো,—পা'টাই কি মানুষের সব!

পা গেলো আর সব গেলো!

হ্যাঁ—গেলো বইকি, রোজগারের জিনিস যে। রোজগার না থাকলে আর রইল কি!

একটা নিশ্বাস পড়লো।

ভোলা বড্ড কষ্টে পথ চলেছে।

ভাবছে, মনটার চেহারা নেই—কেউ দেখতে পায় না। থাকলেই বা কি হ'ত!

ভোলা একটু হাসলে,—ছিঃ, ছিরু আমার সে দেমাক্ আর রাখে নি।

সে আর চলতে পারছিল না। পথের ধারের পলাশ গাছটা ঠেশ্ দিয়ে জিরুতে লাগলো।—

আশা আকাঙ্খার স্বপ্ন-ভাঙ্গা পৃথিবীর পরিত্যক্ত জীব! সে-চখে জগতের কোনো জিনিসই আর আগ্রহ জাগায় না। সে বুজতেই চায়!

কতক্ষণ কেটে গেছে!

*   *

*

ভোলা না?

সে চেয়ে বললে হ্যাঁ—পিসি।

ওমা—একি চেহারা হয়ে গেছে! এতকাল কোথায় ছিলি,—তোকে সবাই খুঁজছে। ছিরু তো ঘানি টানতে চললো,—যাবে না! মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া,—হুঁঃ। সব শুনেছিস তো—আজ যে মকদ্দমা,—ফিরতে আর হবে না।—ক্ষ্যামতা নেই,—সাধ আছে! চুরি করে সাধ মেটানো! ধম্মো আবার নেই,—এখন ছুঁড়ি—ভোলা ভোলা করে মরছে। একবার যা না,—পায়ে না ধরে তো তখন বলিস্—

ভোলা তাড়াতাড়ি বললে—যাব পিসি।

হঁ,—যা। আমি হাট থেকে আসি।

পিসি চলে গেল!

বুকের বেদনায় আর পথশ্রমে ভোলা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এখনো—পাঁচ পো পথ।

তার চট্কা ভাঙলো।

হুঁ—যাবো বই কি। লক্ষ্মী, যাচ্ছি ভাই—ভাবিস নি!

ভোলা চললো। মন চুপ করে রইল না!—"পিসি বললে—ক্ষ্যামতা নেই, সাধ আছে!" পিসি বোঝে না।—

—সাধ আছে তো? আবার কি চাই? সাধ থাকে কেনো?—থাকবে না?—

—হুঁঃ, সাধের জোর যে কতো, সেটা কেউ ভাবে না। এই সাধের ধাক্কা খেয়েই তো বাদ্‌লে-পোকার পালক বেরিয়ে আসে। আলোর জন্যে সে ছট্‌ফট্ করে,—ছুটে গিয়ে তাকে পায়,—তার পর মরে। পায় তো! না পেয়ে তো মরে না,—সাধ তো মেটে।—

—মরে তো সবাই,—মরতে তো হবেই, পেলে হ'লেই হ'ল। আবার কি চাই!

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ব্যথা-বোধ কি চিন্তা মনে আর ছিল না,—ভোলা যন্ত্রের মত চলেছে!

যেন গরুর গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়েছে,—হাতের লাগাম্ খসে পড়েছে,—গরু তা জানে না,—জানবার দরকার কি! সে আপনার পা বাড়িয়ে চলেছে।

*   *

*

বারাকপুরের কাচারির এজলাস ঘরে আর তার বারাণ্ডায় আজ লোক ধরে না।

বেলা তিনটের পর বীরেন উকীল শামলা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসি-মুখে বেরিয়ে, ফতের ফ্‌র্ত্তিতে আলপাকার পাল তুলে দ্রুত বার্-লাইব্রেরীতে যাবার সময়—যেন জনান্তিকে জানিয়ে গেলেন,—বেটা দাগী-চোর,—ঠেলেছিও ঝেড়ে!

পরক্ষণেই লক্ষ্মী এজ্‌লাস-ঘরে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠলো—

ও-সব মিছে কথা গো—মিথ্যে কথা,—মিথ্যে কথা, —ও কিছু জানে না,—মিছে কথা বলছে। তোমরা ওকি ক'রছো,—ওগো ওকে,—ওগো এ কি করলে গো—

ভোলা হাত কড়ি পরে বেরিয়ে এলো!

লক্ষ্মী মূর্চ্ছা গেছে!